ব্যবহার দর্শন।

প্রথম খণ্ড।

(উপক্রমণিকা ভাগ)

OR

AN INTRODUCTION

TO THE SCIENCE OF POLITICS.

আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

"যখন যে কার্য্য কর, স্বজাতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া করিও"

কলিকাতা

নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন,

রায় যন্ত্রে,

শ্রীআশুতোষ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ও

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।

১৭৯৯ শকঃ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থমধ্যে যাহা বলিবার, গ্রন্থকার উপসংহারে তাহা সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন; সুতরাং এ গ্রন্থের অবতারণায় আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তবে এইমাত্র বলিলে দ্বিরুক্তি হইবে না, যে ঈদৃশ গ্রন্থ অস্মদ্দেশে বিদ্যালয় সমূহের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক পরন্তু বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অর্থানুকূল্য-লাভ কামনাও এই গ্রন্থ প্রচারের অন্যতর উদ্দেশ্য। আমাদিগের দৃঢ় ভরসা এই, গুণগ্রাহী শিক্ষিত সমাজ গ্রন্থকারের প্রথম চেষ্টার ফল স্বরূপ এই ব্যবহারদর্শন প্রথম খণ্ডকে উপযুক্ত আদর করিয়া তাঁহার প্রতিভাকে উৎসাহিত ও অধ্যবসায়কে পুরস্কৃত করিবেন অলমিতি বিস্তারেণ।

ময়মনসিংহ জেলাস্কুল
১লা ফাল্গুন
১৭৯৯ শকঃ

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

উৎসর্গ।

চিরপ্রীতিভাজন বঙ্গবাসীদিগের হস্তে
এই গ্রন্থ পরম সমাদরে
অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রবৃত্তি ও জ্ঞান	১
জ্ঞান ও অনুশাসন-বাক্য	৩
দর্শন ও শাস্ত্র	৪
শাস্ত্র দর্শনের অনুযায়ী	৬
দর্শনের উৎপত্তি	৭
প্রবৃত্তি ও শক্তির বিকাশ	৮
সাধারণ বুদ্ধি ও দর্শন	১০
ব্যবহার দর্শনের উৎপত্তি	১২
আসঙ্গলিপ্সা ও স্বার্থের কাল	১৪
ভয় ও ভক্তির কাল	১৫
রাজনীতির উৎপত্তি	১৭
সাধারণ মঙ্গলের কাল	১৮
সাধারণ মত	২০
অধিকাংশের মতই সাধারণ মত	২১
রাজপদের প্রাধান্যলোপ	২২
প্রকৃত রাজা কি	২৩
ব্যবহার দর্শন ও ব্যবহার শাস্ত্র	২৫
ভারতে দর্শন	২৭
ভারতে ব্যবহার দর্শন	৩০
ভারতে রাজনীতি ও রাজব্যবস্থা	৩২
ব্যবহার দর্শনের আলোচনাভাব।	৩৫
ব্যবহারদর্শনে জ্ঞান না জন্মিলে ব্যবহারশাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে না	৩৮

বিষয়				পৃষ্ঠা।
ব্যবহার দর্শনানুশীলনের ফল ..	...			৪১
ভারতে ব্যবহার দর্শনালোচনার আবশ্যকতা			..	
উপসংহার	...	...	...	

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যবহারদর্শন				৬৫
সমাজ	...	...	...	৬৬
বিধি ও শাস্ত্র	..	...	..	৬৭
স্বত্ব	...	...	...	৬৮
প্রজা	.	...	.	৬৯
প্রজাশক্তি	...	...	...	ঐ
রাজা	..	.	..	৭০
রাজশক্তি	..	...	..	৭১
রাজকীয় বিশেষ অধিকার	..	...	..	ঐ
রাজ্য	...	..	...	৭২
রাজ্যাধিকার	...	...		ঐ
রাজত্ব		...	...	৭৩
রাজশক্তির অতিব্যবহার	..	...	...	ঐ
প্রজাশক্তির অতিব্যবহার	...	...	...	ঐ
রাষ্ট্রবিপ্লব	.	.	...	৭৪
রাজবিপর্য্যয়	...	..	..	ঐ
প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়	...	...	...	ঐ
অরাজক	...		...	ঐ
অপ্রাকৃত অবস্থা				

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাম্রাজ্য	৭৫
দ্বীপরাজ্য	,,
উপনিবেশ	,,
করদ রাজ্য ...	৭৬
সন্ধি ...	,,
বিগ্রহ	৭৭
মিত্ররাজ্য	,,
রাজশক্তির সাম্য	,,
বস্তু	৭৮
ধন	৭৯
মূল্য	৮০
মুদ্রা	৮১
প্রজাস্বত্ব	৮৩
রাজকার্য্য	,,
রাজব্যয়	৮৪
রাজস্ব	,,
রাজঋণ	৮৫
কর	৮৬
ব্যক্তি	৮৭
প্রজা প্রতিনিধি	৮৮
প্রজা-প্রতিনিধিসভা	৯০
রাজপ্রতিনিধি	,,
রাজমন্ত্রী বা সচীব	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজবল	৯২
ব্যবস্থাপক	[illegible]
অপরাধ	৯৩
দণ্ড	,,
বিচারক	৯৪
কার্য্যনির্ব্বাহক	,,
জাতি	৯৫
সম্প্রদায়	৯৬
শ্রেণী	,,
বৃত্তি	৯৭
ব্যবসায়	,,
বাণিজ্য	৯৮
কৃষি	৯৯
শিল্প	,,
সাহিত্য	,,
সঙ্গীত	,,
বেতন	,,
পারিশ্রমিক	১০০
রাজসেবা	,,
চাকুরি	,,
মজুরি	১০১
সম্পত্তি	,,
উপস্বত্ব	,,
উত্তরাধিকার	১০৩

ব্যবহার দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

মনুষ্য মাত্রই স্বকীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য
প্রবৃত্তি ও জ্ঞান
করিতে ভালবাসে। কিন্তু প্রবৃত্তি অন্ধ, উহার সদসৎ-বিচারের ক্ষমতা নাই; রুগ্ন দেহেও রসনা কুপথ্য ভক্ষণেই লালায়িত হয়। প্রবৃত্তির পরিচালক থাকা আবশ্যক। অনুচিত বিষয়ে প্রবৃত্তির গতি ও সৎ বিষয়ে প্রবৃত্তির বিরাগ শোচনীয়। যদ্দ্বারা প্রবৃত্তি শাসিত ও যথাপথে পরিচালিত হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি, সুখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্তি বা ঈশ্বর লাভের প্রবৃত্তি আছে। তাই বলিয়া চিরকাল পৃথিবীতে বসতি করিবার আয়োজন করা, বা অমিত সুখাদ্য উদরসাৎ করিয়া অজীর্ণগ্রস্ত হওয়া, অথবা ঈশ্বর-লাভ কামনায় অনশনে অকাল-মৃত্যু সংঘটন

করা কর্ত্তব্য নহে। এই উপদেশ আমরা জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হই। জ্ঞানই উপদেষ্টা হইয়া ঔচিত্যানৌচিত্য প্রদর্শন করে

মনুষ্য প্রকৃতির দুই অঙ্গ,—প্রবৃত্তি আর জ্ঞান ঠিক যেমন শরীরের দুইটী অঙ্গ, পদ ও চক্ষু পদে ভর করিয়াই মনুষ্য চলিয়া থাকে, কিন্তু চক্ষু না থাকিলে মনুষ্য চলিতে পারে না; চলিলেও নিতান্তই বিপথে চলিবে মানবজাতি প্রবৃত্তি ও জ্ঞান এই উভয়েরই সহ-যোগ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রবৃত্তিরই প্রবর্ত্তনায় মনুষ্য পরিচালিত হয়, এবং এই জন্যই সকলেরই প্রাথমিক অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং অনুন্নত। কিন্তু একবার জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই তাহার উপদেশে কার্য্য করা বিধেয় যতক্ষণ চক্ষু স্ফুটিত না হয়, মার্জ্জার-শিশু অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও প্রসূতির অনুস্থান করিবেই করিবে। কিন্তু চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে আর তাহার উহা মুদ্রিত করিয়া প্রসূতির অনুসন্ধানে শৃগালীর কবলে পতিত হওয়া উচিত নহে একেবারে প্রথমাবস্থায় না হউক, জ্ঞানই মানব জাতির নেতা।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সংসারে এমন অনেক বিষয় আছে, আত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরিণাম নির্দ্ধা-

রণ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইব, মনুষ্য এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারেনা। এস্থলে দেখা আবশ্যক যে, ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অমঙ্গল হইবেনা, আত্মজ্ঞান যত ক্ষণ না এ পর্য্যন্ত সায় দেয়, তত ক্ষণ মনুষ্য সে বিষয়ে নিবৃত্ত থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, মনুষ্য-জ্ঞান ভ্রান্ত, তাহার উপদেশ সর্ব্বথা পালনীয় নহে। এই স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞানের ভ্রান্ততাও প্রতিপাদিত হয়, অতএব জ্ঞানের উপদেশ ও নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

জ্ঞান ও অনুশাসন বাক্য

যখন কতকগুলি লোক একত্র দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদিগের সকলেই উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানের উপদেশেই কার্য্য করিবে, ইহা অসম্ভব পারিলেই কি? পরস্পরে জ্ঞানের মীমাংসা বিপরীত হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু সকল সমাজেই অধিকাংশ লোক অজ্ঞ থাকে আবার কোন ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া ও স্বভাব, অভ্যাস বা সংসর্গ দোষে জ্ঞানের উপদেশে পরিচালিত নাও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় এমন কতকগুলি বিধি থাকা অবশ্যক, যাহা সকলকেই পালন করিতে হইবে.

নতুবা সমাজিকেরা পরস্পর স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভয়ানক বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া কস্মিন্ কালেও সমাজ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেনা সেই সকল অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধিকে অনুশাসন বাক্য বলে।

জ্যামিতি শাস্ত্র সংগঠন করিতে হইলে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য স্থির করিয়া লইতে হয়; সেইরূপ কোন্ সমাজ সংগঠন করিতে হইলেও কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য স্থূল বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হয়। ঐগুলি সমাজের ভিত্তি স্বরূপ; অর্থাৎ উহাদিগের উপরেই সমাজ সংস্থাপিত হয়। সমাজের উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে উত্তর কালে সেই সকল বিধি মার্জ্জিত হইয়া সমাজের ভিত্তি দৃঢ়তর এবং সমাজের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পরদ্রব্য অপহরণ করা অন্যায়, এটী জ্ঞানের সিদ্ধান্ত; অতএব পরদ্রব্য অপহরণ করিওনা, এটী জ্ঞানের উপদেশ। কিন্তু যখন কোন সমাজে এইরূপ বিধি হয় যথা;— পরদ্রব্য অপহরণ করিওনা, করিলে দণ্ডিত হইবে; তখন ইহা অনুশাসন-বাক্য হয়।

যাহার অনুশীলনে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে। দর্শন ও শাস্ত্র আর যে সকল বিধি দ্বারা জ্ঞান কার্য্যে

পরিণত হয়, তাহাদিগের সমষ্টিকে শাস্ত্র বলে। বাস্তব দর্শন ও শাস্ত্র এই দুইটী শব্দের অর্থও এইরূপ। দর্শনে অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যায়, আর শাস্ত্র দ্বারা লোক সমাজ (জ্ঞানানুযায়ী) শাসিত হইয়া রক্ষিত হয়। প্রত্যেক বিষয়েই দর্শন ও শাস্ত্র আছে কি ধর্ম্ম কি ব্যবহার কি সাহিত্য, এ সকলেরই মধ্যে দর্শন ও শাস্ত্র আছে। ইংরেজীতে দর্শনকে সায়েন্স Science. ও শাস্ত্রকে ল্ব Law বলে সপ্তাহে একদিন বিশেষভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তা করিতে হয়, এটী না করিলে লোকচরিত্র ভাল থাকেনা; সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে; নিয়মিত রূপে কিছু না করিলে সমাজের উন্নতি হয় না; ইত্যাদিই দর্শনোক্তি আর এই জন্যই রবিবারে বিচারক রাজকার্য্য করিতে বাধ্য নহেন; ইহা শাস্ত্রের বিধি যাহা কিছু ব্যাপক তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে অধিক সময় ও অধিক পরিশ্রম আবশ্যক, অথবা এক বস্তু বারংবার ব্যবহার করিলে রুচিকর হয় না; ইহাই দর্শনোক্তি। এইজন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বিধি এই যে, নামের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজ সংগঠন ও সংরক্ষণার্থ জ্ঞান অনুশাসন বাক্যেও শাস্ত্রে দর্শনে পরিণত হয়।

শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত কিন্তু দর্শনানুযায়ী

মনুষ্য যত বুঝিতে পারে, কার্য্যে তত করিতে পারে না, অপিচ সকল লোক সমান বোঝেনা; এই জন্য সকল সমাজেই দর্শনাপেক্ষা শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কোন স্থানে ও কোন কালে সমস্তটী দর্শন শাস্ত্রে পরিণত হইতে পারে নাই। দর্শনে অধিকার অল্প লোকের, সাধারণ লোক শাস্ত্রদ্বারাই সম্পূর্ণ রূপে পরিচালিত হয় দর্শন বলিতেছে; ভৃত্যের প্রতি বন্ধু ব্যবহার কর, তাহাতে তোমার কার্য্য ভাল হইবে, ভৃত্যের ও চরিত্র উন্নত হইবে; ইত্যাদি। শাস্ত্র আদেশ করিতেছে;—দর্শনের যোল আনা উপদেশ রক্ষা করিতে না পার, ভৃত্যকে তাহার বেতন দিতেই হইবে

শাস্ত্র দর্শনের সকল উপদেশ পালন করিতে পারেনা বটে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে দর্শনের অনুযায়ী। যাহা অনুযায়ী না হয়, তাহাকে কুশাস্ত্র বলি ব্যবহার-দর্শনের উপদেশ এই যে, বিভিন্ন দেশ বা রাজ্যের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, তাহার উপরে কোন রূপ কর গ্রহণ করিলে স্বাধীন বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়া স্বদেশ কি বিদেশ উভয়েরই ক্ষতি হয়; অতএব ঐরূপ শুল্ক গ্রহণ অকর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক দেশে এইরূপে শুল্ক গ্রহণের বিধি আছে। ঐ বিধিকে কু বিধি, এবং যাহাতে ঐরূপ বিধি

স্থান পায়, তাহাকে কুশাস্ত্র বলিতে হইবে। পূরাকালে য়ুনানীদেশীয় শাসনকর্ত্তা লাইকারগাস প্রজাবর্গকে চতুর ও সমরক্ষম করিবার জন্য এইরূপ বিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, যে কেহ স্পার্টা নগরের মধ্যে অন্যের দ্রব্য চুরি করিয়া আনিতে পারিবে, তাহার দণ্ড হইবেনা। এটা যে নিতান্তই কুবিধি কে অস্বীকার করিবে?

ইতিহাস ও ভূযোদর্শন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে,—অতি প্রাচীন কালে মানবজাতি অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় অব-স্থিতি করিত। অধুনা যেমন কৃষি শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া জনসমাজ-কে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইতেছে, তৎকালে ইহার কিছুই ছিলনা। সেই আদিম অবস্থায় মনুষ্য শীতাতপে পরিক্লান্ত হইয়া তৃণক্ষেত্রে অথবা ভূগর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিত, এবং ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত-হইয়া অরণ্যে অরণ্যে বনপশুবই পশ্চাদ্ধাবিত হইত।

দর্শনাদির আলোচনায় আদৌ দুইটী বিষয় আবশ্য-কীয়। ১ম মনুষ্যের মানসিক শক্তির বিকাশ, ২য় ঐ সকল শক্তিকে যথোপযুক্তরূপে পরিচালিত করিবার অবকাশ। অতি আদিম কালে মানবজাতির এই দুই বিষয়ের একটীরও সদ্ভাব ছিলনা। যদি জনসমাজ

উন্নতিশালী হয়, তবে নিঃসংশয়ীতরূপে স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন মনুষ্যমন নিতান্তই জড় অবস্থায় অবস্থিতি করিত। তখন ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিচর্য্যা করিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইবার ও অবসর পাওয়া সুকঠিন হইত। তৎকালে মনুষ্য-মন যুক্তি, ন্যায়, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি ধারণা করিতেও সক্ষম ছিলনা, অপিচ এ সকল বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার অবসর ও পাইতনা। অতএব তৎকালে দর্শনাদির অনুশীলন না হওয়া বিচিত্র নহে। মানবজাতির বর্ত্তমান উন্নততর অবস্থাতেই আমারা দেখিতে পাই, নিম্নশ্রেণীর ইতর লোকেরা একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই সংসারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া পারিয়া উঠিতেছে না। দর্শনাদির অনুশীলন দূরে থাকুক, দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং উৎসবামোদাদিতেও যোগ দান করিতে সমর্থ নহে। অতএব এ কথা নিশ্চিত যে, অপেক্ষকৃত অধুনাতন কালেই দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে।

দর্শনের উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে হইবার প্রধান কারণ এই।—জীব মাত্রেরই প্রবৃত্তি ও শক্তি এ দুইটী আছে এতদুভয়ের প্রবর্ত্তনা ও সাহায্যেই সকলে কার্য্য করিয়া থাকে, অপিচ এতদুভ-

প্রবৃত্তি ও শক্তির বিকাশ

য়ের মধ্যে প্রবৃত্তিরই অগ্রে বিকাশ হয়; শক্তির বিকাশ পরেই হইয়া থাকে অন্যের প্রাণবধ করিবার ইচ্ছা শ্বাপদ-শিশু স্বীয় জন্মের অল্পকাল পরেই প্রকাশ করে, কিন্তু তদুপযোগী সামর্থ্য অনেক পরে প্রাপ্ত হয় তরল-মতী বালিকারাও ক্রীড়াচ্ছলে গৃহিণী সাজিয়া পুত্তলিকা ক্রোড়ে লইয়া পারিবারিক সুখলালসাও অপত্য স্নেহাদি চরিতার্থ করে, কিন্তু পরিবার-প্রতি পালন সামর্থ্যাদি তাহার অনেক কাল পরে জন্মিয়া থাকে।

মনুষ্যের প্রবৃত্তির নাম হৃদয়, এবং শক্তির নাম মন। মনুষ্য হৃদয় বিশ্বাস, আশা, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতির আবাস, মনুষ্য মন স্মৃতি, চিন্তা ও বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির আবাস। যদি প্রবৃত্তির বিকাশ অগ্রে হয়, তবে মানিতে হইবে যে, মনুষ্যের ভক্তি বিশ্বাস কল্পনা প্রভৃতিই অগ্রে প্রবল হইবে। মনুষ্যের স্মৃতি, চিন্তা ও বিচার-শক্তি অপেক্ষা-কৃত পশ্চাতে বিকাশিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যেরূপ, জনসমাজে ও ইহাই ঘটিয়াছে। জগ-তের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে কোন জাতি হউক না কেন, তাহাতেই অগ্রে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও কবির সৃষ্টি হইয়াছে; দার্শনিক অপেক্ষাকৃত অনেক পরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা ধর্ম্ম

ও কার্য্যের সঙ্গে বিশ্বাস, ভক্তি ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির হেতু সুখস্পৃহার সুতরাং হৃদয়ের অর্থাৎ মনুষ্য-প্রবৃত্তির যেরূপ সম্বন্ধ, দর্শনের সঙ্গেও চিন্তা স্মৃতি ও বিচার শক্তি সুতরাং মন অর্থাৎ মনুষ্য শক্তির সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ। ভারতবর্ষে বেদ ও রামায়ণাদির অনেক পরে সাংখ্যাদি দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রীশদেশেও বহু সংখ্যক পুরাণ ও ইলিয়দাদি কাব্যের অনেক পরে সক্রেটিশ ও প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন

সত্যানুসন্ধান দর্শনের উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তিই হউক কি কোন সমাজই হউক, প্রথমাবস্থায় কাহারও সত্যের প্রতি তত সমাদার থাকে না। সে সময়ে সকলেই ভাবুকতার একান্ত পক্ষপাতী থাকে। বালকের যেমন সত্য কথা উপেক্ষা করিয়া অসম্ভাবিত উপন্যাস অধিক ভালবাসে, প্রত্যেক জাতিও সেই রূপ প্রথমাবস্থায় সত্য শাস্ত্রের আবিষ্কারে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া অলৌকিক কল্পনাপূর্ণ পুরাণাদিতে অনুরক্ত থাকে। উত্তর কালে আর কেহ তাহা ভাল বাসেন। মানসিক শক্তির ক্রমশ বিকাশই এই অবস্থা ভেদের কারণ।

সাধারণ বুদ্ধি ও দর্শন

দার্শনিক যতই অভিমান করুন না কেন, মানিতে হইবে—অনেক দিনের পর্য্যবেক্ষ-

শাদি দ্বারাই বহু দর্শন ও কার্য্য-কারণ জ্ঞানাদি জন্মে। সর্ব্বাগে সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই সমাজ সংরক্ষিত ও পরিচালিত হয়। এই সাধারণ বুদ্ধিই উন্নত, মার্জ্জিত ও অধিকতর বিচারক্ষম হইলে জ্ঞান নাম ধারণ করে সাধারণ বুদ্ধি পূর্ব্বে যাহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিত, জ্ঞান, পুনঃ পুনঃ দেখিয়া এবং বহু বিষয়ের তুলনাদি করিয়া তাহাকেই কোন ন কোন বিধানের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান বল আর দর্শন বল, সকলই সেই সকল ঘটনারাজির উপরে সংস্থাপিত।

অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োজনে ঠেকিয়া যাহা করিয়াছিল, দর্শনও অনেক স্থলে তাহাই করিতে ব্যবস্থা দিতেছেন; তবে তাহাতে যত ইচ্ছ যুক্তি তর্কের প্রয়োগ করিতেছেন। পূর্ব্বে সমাজে দুর্ব্বলেরা নিজ হিতের জন্যই প্রবলদিগের শরণাপন্ন হইত এইক্ষণও দর্শন বলিতেছেন,—সমাজে প্রবলেরাই (গুণী, জ্ঞানী ও আঢ্যেরাই) কর্ত্তৃত্ব করিবে তবে দর্শন একটুকু বহুদর্শী বলিয়া কয়েকটী যুক্তির সমাবেশ করিতে পারেন মাত্র। প্রকৃত মনুষ্য-প্রকৃতি কদাপি নিন্দনীয় নহে। পিতামহকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার কাহারও উপায় নাই।

ফলতঃ মনুষ্য প্রকৃতিতেই দর্শন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য চিরদিনই ভাল মন্দ বিচার করিয়াছে, "কেন ?" "কি প্রকারে ?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছে, প্রশ্নের মীমাংসায় যত্নশীল হইয়াছে ; অর্থাৎ জ্ঞানের উপদেশেই কার্য্য করিয়াছে। তবে জ্ঞান কিছুকাল বিলম্বেই বিকাশিত হয়, উহার কার্য্য অগ্রে চিনিয়া লওয়া যায় না। এইজন্য জন সমাজে জ্ঞানের শাসনাপেক্ষা প্রয়োজনের শাসন অধিক দেখা যায় অস্ফুট জ্ঞানে দর্শনের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখনই জ্ঞান বিকাশিত হইয়া প্রত্যক্ষও প্রবলরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই বিচার সমন্বয় যখন অনুশীলনের উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে দর্শন বলে

ব্যবহার দর্শনের উৎপত্তি

একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্যবহার-দর্শনের উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে হইয়াছে গণিত বল জ্যোতিষ বল আর মনোবিজ্ঞানই বল, এ সমুদয় বিষয় মনুষ্য একাকী ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও অনুশীলন করিতে পারে, করিবার আয়োজন ও আছে মনে কর যখন মনুষ্য নিতান্ত অসভ্য অবস্থায় একাকী ভূগর্ভে বসতি করিত, কিম্বা একাকী বন্য পশুর পশ্চাদ্ধাবন করিত ; তখনও অন্তরীক্ষে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডলীর গণনায় চেষ্টিত হইতে পারিত। এক নক্ষত্র পুঞ্জের সংখ্যা হইতে অল্পতর সংখ্যা-বিশিষ্ট নক্ষত্র-পুঞ্জকে বিযোগ করিয়া অবশিষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারিত, এবং এই উপায়ে গণিত-শাস্ত্রের দুই একটী মূল নিয়ম শিক্ষা করিতে পারিত। বারংবার বিনা চেষ্টায় কোন বিষয়ে বাসনার গতিকে স্বাভাবিক বলিয়া অনুমান করিতে পারিত, এবং পুনঃ পুনঃ তদ্বিপরীত চেষ্টা করিয়া অন্তরের বিভিন্ন গতিকে অভ্যাসের ফল বলিতে পারিত; এবং এই রূপে স্বভাবও অভ্যাসের তারতম্য বুঝিয়া মনোবিজ্ঞানের দুই একটী স্থূল সূত্র আয়ত্ত করিতে পারিত। কিন্তু ব্যবহার দর্শনের উপকরণ সমাজ; যত দিন না মনুষ্য সমাজ-বদ্ধ হইয়াছে, সমাজ-বন্ধন ও একতার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়াছে, ততদিন ব্যবহার-দর্শনের সৃষ্টি হইতে পারে না।

মানব জাতির সমাজ-বন্ধনের কোন ইতিহাস নাই। কোন্ সময়ে কোন্ দেশের অধিবাসীরা কি রূপে সমাজ-বদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেহই স্পষ্ট বলিতে পারেনা। প্রাচীনকালের কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত অনেক ইদানীন্তন কালেরও যথাযথ ইতিবৃত্ত নাই। অতএব

যুক্তি অনুমান ও সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই মনুষ্যের সামাজিকতার এই কয়টী কাল স্থির করা যাইতে পারে।

১ম, আসঙ্গলিপ্সা ও স্বার্থের কাল

কেবল মনুষ্য কেন, জীব মাত্রেই আসঙ্গলিপ্সার বশবর্ত্তী। ছাগ মেষ বিহঙ্গেরাও দলবদ্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। একথা নিশ্চিত, যে নিতান্ত অসভ্য অবস্থায়ও মনুষ্যেরা পরস্পরের নিকট বাস করিতে ভাল বাসিত। লোক মাত্রেই যখন ভিন্নরুচি, তখন পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও মনুষ্য একে অন্যের সামীপ্য পরিত্যাগ করিতে পারে না মন প্রকৃতিস্থ হইলেই স্বজাতি সহবাস-লালসায় লালায়িত হয়। প্রথমতঃ এই প্রবৃত্তি, এবং দ্বিতীয়তঃ স্বার্থানুরোধেই মানবজাতি প্রথমতঃ কতিপয় লোক, অথবা কোন কোন দেশের অবস্থানুসারে কতিপয় পরিবার একত্র হইয়া বসতি করিত। স্বার্থানুরোধ এই যে, এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিলে পান ভোজনাদি উপজীব্যের ও ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পরস্পরের সহায়তা লাভ করা যাইবে। অদ্যাপি আমমাংস-ভোজী পার্ব্বত্য অসভ্যদিগের কোন কোন দল এইরূপে বসতি করিতেছে।

এই অবস্থাকে প্রকৃত সমাজ বন্ধন বলা যায় না, এবং এ অবস্থায় ব্যবহার-দর্শনেরও সৃষ্টি অসম্ভব। কেননা, প্রকৃত সমাজ-বন্ধন অর্থাৎ "সমাজের সকল গুলি লোকের মধ্যে উন্নতি বা অবনতি ও পরস্পরের সুখ দুঃখাদি অনুস্যূত" এই জ্ঞানই ব্যবহার দর্শনের ভিত্তি। যে কোন প্রকারে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইলেই তাহাদিগের মধ্যে এক অতি নিকৃষ্ট সমাজিকতার উৎপত্তি হয়। ইহাই সেই সমাজিকতা মাত্র।

২য়, ভয় ও ভক্তির কাল

কতকগুলি অসভ্য লোকের মধ্যে কোন ব্যক্তি বাহুবলে অথবা অন্য কোন রূপ শ্রেষ্ঠতা দ্বারা অপরাপর সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, সেই সকল লোক ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আপনাদিগের অক্ষমতা হেতু বা ভয় বশতঃ সেই ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করে। এইরূপে প্রথমতঃ জনসমাজে প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, পার্ব্বত্য অসভ্য জাতীয় দিগের মধ্যে এরূপ প্রভুত্বই বিরাজ করিতেছে। নিকৃষ্টেরা স্বকীয় অক্ষমতা হেতু ভীত হইয়াই শ্রেষ্ঠের আনুগত্য স্বীকার করিতেছে, সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে। তাহারই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসতি করিতেছে। এই রূপেও এক প্রকার নিকৃষ্ট

সমাজ-সংগঠন হয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত সমাজ বন্ধন নহে, এবং তাহা হইতেও ব্যবহার-দর্শনের সৃষ্টি হইতে পারেনা। অপিচ প্রত্যেক দেশে এই রূপেই প্রাথমিক অবস্থায় প্রভুত্ব ও রাজপদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অতঃপর যখন মানবজাতি আরও একটুকু উন্নত হইতে চলিল, যখন মানুষের পাশব স্বভাবের খর্ব্বতা হইয়া ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তখনই ভয় ভক্তিতে পরিণত হইল। যখন মনুষ্য অলৌকিক কিছু দেখিলেই তাহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করিতে লাগিল, তখনই সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ প্রভু বা রাজাকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন এবং প্রস্ফুটোন্মুখ কল্পনা প্রভাবে দেবাবতার এবং তাহার বংশধরদিগকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতে এবং তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। প্রত্যেক দেশের পুরাবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক কালে রাজভক্তির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যে সকল দেশেই রাজ-পরিবারেব বংশাবলী দেবদেবীর বংশাবলী বলিযা গণ্য হইত। এই রূপে ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ ও নাগবংশাদির সৃষ্টি হয়। এ সময়ে প্রত্যেক দেশে যে সামাজিকতা জন্মে, তাহা

অনেক উৎকৃষ্ট; এমন কি তাহার দুই একটী বিষয় অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী বটে কিন্তু এ সময়ের সামাজিকতা ও উৎকৃষ্ট সমাজ-বন্ধন নহে; প্রকৃত ব্যবহার দর্শনের মূল মন্ত্রও কেহ তৎকালে অবগত ছিল না প্রকৃত ব্যবহার-দর্শন সুতরং প্রকৃত সমাজ বন্ধনের মূল মন্ত্র পরস্পর সম সুখদুঃখ ভাগীতা। তৎকালিন সামাজিকতার হেতু এই সম সুখ দুঃখ ভাগীতা নহে উহার হেতু ভক্তি এবং তদ্বিনিময়ে স্নেহ বা সদ্ব্যবহার।

রাজনীতির উৎপত্তি।

এই সময়ে ভক্তি এবং স্নেহের-সংঘর্ষণে একটী শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম রাজনীতি শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রে প্রজার পক্ষ হইতে রাজার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উপায় এবং রাজার পক্ষ হইতে প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপায় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বলিতে কি তৎকালে রাজায় প্রজায় এরূপও সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, যে প্রজাগণ রাজসেবাকে দেবসেবা মনে করিত ও রাজ দর্শনে পুণ্য পত্যাগ করিত। পক্ষান্তরে রাজাও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন, প্রজার জন্য অকাতরে প্রাণ দান করিতেন। বস্তুত তৎকালে রাজা প্রজায় পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ছিল; রাজা প্রজার-সম্বন্ধ ছিল না। রাজা প্রজায় সম্বন্ধ কি, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

অতঃপর যখন মানবজাতি আরোও উন্নত হইতে লাগিল, যখন নবপূজার অবসান হইতে লাগিল; তখন রাজার প্রতি ভক্তির ও হ্রাস হইয়া আসিল। পূর্ব্বে সকলেই রাজাকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করিত, ইহ পরকালের সমুদয় সুখের মূলীভূত মনে করিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। রাজার অসদাচরণ হেতু অসুখ ও অবনতিকে দৈব নিগ্রহ মনে করিত, এবং অদৃষ্টের নিন্দা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু রাজার প্রতি যখন সেই ভক্তির হ্রাস হইল, যখন আর সকলে এক মাত্র রাজাকেই প্রকৃতি পুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ সৌভাগ্যের উৎস ভাবিতে পারিতনা, তখন মানব জাতি কি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে? কাহা হইতে সমাজের মঙ্গল প্রত্যাশা করিবে? তখন জনসমাজ দেখিতে পাইল, যে এক মাত্র সম-সুখদুঃখ ভাগীতাই সমাজ-বন্ধনের ও সংরক্ষণের মূল, এবং তদ্বিষয়ক উন্নত ব্যবস্থাদিই সমাজের মঙ্গলের হেতু। মনে কর, পূর্ব্বে রাজা দেবতাছিলেন, সমাজ-বন্ধনের একটী সেতু ছিল; নিরাপত্যে সকলেই রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত, তাহাতেই সমাজের কার্য্যকলাপ অতি সুন্দররূপে না হউক, অবিসংবাদিত রূপে নির্ব্বাহিত হইত। এই দেশ রাজা

সাধারণ মঙ্গলের কাল

দেবতা নহেন, সকল বিষয়েই তাঁহার আদেশ পালনীয় নহে ; সংপ্রতি কিরূপে সমাজের কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইবে ? কিরূপ বিধি প্রকৃতিপুঞ্জের পালনীয় হইবে ? এই ক্ষণ অবশ্যই মানিতে হইবে, যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয় তাহাই করণীয়

"যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয়, তাহাই করণীয়" এই কথা স্বীকার করিবা মাত্রই মানব জাতিকে দেখিতে হইয়াছে, যে "সেই সাধারণের মঙ্গল" কেন করিতে হইবে। যত কাল রাজা দেবতা ছিলেন, তত কাল সকলেই স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছি ; মনে করিয়াছি, তাহাতে পরম মঙ্গল হইবে এই ক্ষণ ও যাহাতে নিজের পরম মঙ্গল হইবে মনে করি, তাহাই করিনা কেন ? মনুষ্য-মনে স্বভাবতই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্য তখন ঐ পন্থাই অবলম্বন করে নাই কেন ? না তাহা, করিতে পারেনা। চিন্তাশীলেরা দেখিলেন, যদি কোন সার্ব্বভৌম বিধি ব্যবস্থা না থাকে, প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করে, তবে জনসমাজে স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারাদি প্রবেশ করিয়া উহাকে উৎসন্ন করিবে। এরূপ যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাকে

তাহাতে ক্ষতি হইবে, এমন কি আপততঃ মঙ্গলকর ভাবিয়া অনেকেরই বিষম অনিষ্টকর কার্য্য করা ও অসম্ভব নহে; যাহাতে কেবল তাহার ক্ষতি হইবে না, সমাজের ও একান্ত দুর্দ্দশা আনয়ন করিতে পারে। এখানেই দেখ, মানবজাতি সম সুখ দুঃখ ভাগীতার স্থূল মর্ম্ম বুঝিতে পারিল; বুঝিতে পারিল যে, সমাজে প্রত্যেক লোকের সুখ দুঃখ উন্নতি ও অবনতি অপরের সুখ দুঃখাদির সঙ্গে এরূপ ভাবে গ্রথিত, যে সামাজিক কোন কার্য্য করিতে হইলেই সমাজের সকল গুলি লোকের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, সকলের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই জ্ঞানে যে সমাজ বন্ধন হইয়াছে, তাহাকেই বলি প্রকৃত সমাজ বন্ধন।

সাধারণ মত

সম সুখদুঃখ ভাগীতার স্থূল মর্ম্ম অবগত হইয়াই মানব জাতি ব্যবহার দর্শনের প্রথম জ্ঞান শিক্ষা করিল এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতি দেখিতে পাইল, যে যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহাই সমাজের পালনীয় হইবে বটে; কিন্তু ঐ বিধিই কে প্রচার করিবে? এবং কাহার দ্বারা প্রচারিত হইলেইবা উহা সর্ব্ববাদী-সম্মত হইবে? তখনই সামাজিকেরা বুঝিতে পারিলেন যে

সমাজের সকলগুলি লোকের শক্তি একীভূত হওয়া চাই; সমাজ সেই শক্তির অনুগমন করিবে; সেইশক্তি সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবে; এবং সকলেই সেই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিবে এই শক্তির নাম সাধারণ মত।

অধিকাংশের মতই সাধারণ মত

কতকগুলি লোক একত্রে বাস করিলে তাহারা সকলেই কোন বা সকল বিষয়ে একমত হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; সুতরাং কোন রাজ্যের সকল প্রজার মত লইয়া কার্য্যকরা অসম্ভব। তবে এস্থলে কি করিতে হইবে? এস্থলে দেখিতে হইবে, যখন সকলের মতানুসারে কার্য্য করা অসম্ভব; তখন যত অধিক সংখ্যক প্রজার মত গ্রহণ করিযা কার্য্য করা যায় তাহারই চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য প্রজার মতে রাজ্য শাসন করিবার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী আর নাই। অনেকে মনে করিতে পারে, এই অধিকাংশের মতে রাজ্য-শাসনকে প্রজাবর্গের মতে রাজ্য-শাসন কেন বলিব? ইহাতেও ত কতিপয় কেন অনেক লোকের মতই উপেক্ষিত হইতেছে। এটী তাহাদিগের ভ্রম। ইহাতে কাহাকেও উপেক্ষা করা হয় না। আজি যে প্রজার মত অধিকাংশের মতের বিরোধী বলিয়া উপে-

ক্ষিত হইল, কালি হয়ত তাহারই মত অধিকাংশের মতের পোষক বলিয়া গ্রাহ্য ও কার্য্যে পরিণত হইবে। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার; তবে কথা এই যে সকল সময়ে সকল প্রজার সকল মত গ্রাহ্য করা যায় না এইমাত্র। পরন্তু সকল মত-দাতাই যদি যাহাতে সকলের হিত হয় এরূপ মত প্রদান করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশের একমত যে সকলেরই যথাসাধ্য মঙ্গলকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অধিকাংশের মতই সাধারণ মত এবং ঐ মতানুসারে কার্য্যই সাধারণ মঙ্গলের কার্য্য

রাজপদের প্রাধান্য লোপ

সাধারণ মতের সৃষ্টি হইলেই প্রতিষ্ঠিত রাজপদের সঙ্গে উহার বিবাদ ঘটিল রাজা তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এদিকে সাধারণ মতও তাঁহার উপরে আধিপত্য করিতে যত্নশীল হইল। এইরূপে অনেক দেশেই রাজা প্রজায় ঘোর বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠিল। প্রতিষ্ঠিত রাজপদের ধ্বংশে যে কতকগুলি লোকের বিশেষ কতকগুলি অনন্যসাধারণ সুবিধা ও অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহারা এবং অনুচিত রাজভক্তি-পরায়ণেরা রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম

করিতে লাগিল। এই সংগ্রামে বহু রক্তপাত হইয়া অনেক স্থানে অনেক রাজার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। পুরাকালে রোমরাজ্যে মধ্যে মধ্যে এরূপ বিসম্বাদ ঘটিত, ইদানীন্তনকালে জর্ম্মেনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডদেশে এই বিসংবাদের পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা সাধারণ মতই রাজত্ব করিতেছে। অদ্যাপি অনেক স্থলে রাজপদ প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু তাহাও কোন না কোন পরিমাণে সাধারণ মতের বশীভূত। অধুনা দিন দিন সাধারণ মতের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, ভরসা কর যায়, অচিরে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রাজ পদের ধ্বংশ হইবে।

প্রকৃত রাজ্য কি

যদি প্রজাশক্তি অর্থাৎ সাধারণ-মতের উপর নির্ভর করিয়া এবং প্রজাস্বত্ব অর্থাৎ সাধারণ মঙ্গল-অব্যাহত রাখিয়া কোন রাজ্য গঠিত হইলে উহা সর্ব্বোত্তম হয়, তবে মানিতে হইবে যে ব্যবহার-দর্শনানুযায়ী রাজ্যই প্রকৃত রাজ্য। অপিচ এইরূপ শাসন-প্রণালীই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। যদিও মানবজাতির অসভ্যাবস্থায় রাজপদ প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আবশ্যক ছিল, সে সময়ে সেরূপ না হইলে সাধারণ লোক সমাজ আত্মশাসন সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া

উৎসন্ন হইত, এবং এইরূপ অক্ষমতা নিবন্ধনই যদিও তাহারা তৎকালে রাজপদের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তথাপি সভ্য-সমাজে ঐরূপ শাসন প্রণালী নিন্দনীয় বলিতে হইবে। যে সমাজে সমুদয় না হউক অন্ততঃ বহুসংখ্যক লোকে আপনাদিগের অধিকার বুঝিতে পারিয়াছে, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে, এবং পরস্পরের মঙ্গল কামনায় ব্যবহার প্রণয়নে মতামত প্রদানে সমর্থ, সে সমাজে এক কি কতিপয় ব্যক্তি মাত্রের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে কোনরূপ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনুচিত। ঐরূপ হইলে তদ্দ্বারা সমাজের ক্ষতির গুরুতর কারণ জন্মে, সমাজ তদ্দ্বারা ধ্বংশ না হউক, অন্ততঃ সমাজের যথাযথ উন্নতি হইতে পারেনা। কেননা সকলের সমবেত চেষ্টায় যাহা হইতে পারে, ব্যক্তি বিশেষের কর্তৃত্বে তাহা কখনই সম্ভবেনা। পরন্তু সেই ব্যক্তি অলৌকিক গুণ গ্রাম সম্পন্ন হইলেও ভ্রম-প্রমাদ ও স্বার্থপরতা পরিশূন্য হওয়া অসম্ভব, তদবস্থায় তাহারই ইচ্ছা ও রুচি যদি সাধারণের অদৃষ্টের পরিচালক হয়, তাহাতে সমাজের গুরুতর ক্ষতিই হইবে।

অপর যাহা ব্যবাহার দর্শনানুযায়ী শাসন প্রণালী নহে, তাহাতে প্রজাস্বত্ব অব্যাহত থাকে না। প্রত্যেক

ব্যক্তিরই কতকগুলি এরূপ অধিকার থাকা আবশ্যক, যাহার ধ্বংশ সে স্বয়ং না করিলে অটল থাকিবে। ঐরূপ না থাকা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। যেখানে সাধারণের ঐরূপ অধিকার নাই, সেখানে সমাজ কোন্ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরোত্তর উন্নত হইবে এবং আত্মরক্ষা অর্থাৎ অবনতির পথ রোধ করিবে? অদ্যাপি আমরা দেখিতেছি, স্বেচ্ছাচার-শাসন-প্রণালী-প্রতিষ্ঠিত দেশে প্রজাবর্গের ধন মান ও সম্পত্তি কিছুতেই নিশ্চিন্ত অধিকার নাই, রাজা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই হইতেছে। রাজ্যশাসনের তুমি একটী দোষোল্লেখ কর অবিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে তুমি বলিতে পার সুরাজা হইলে প্রজাবর্গকে পীড়িত হইতে হয়না। সে কথাও সত্য-নহে, কেননা রাজা যাহা প্রশিষ্ট মনে করিতেছেন, প্রজার পক্ষে তাহা কষ্টকর হইতে পারে আর রাজা যদি বুঝিয়া শুনিয়াও স্বেচ্ছাচার ও অবিচার করেন, কে তাহার প্রতিবাদ বা প্রতীকাব করিবে?

ব্যবহার দর্শন ও ব্যবহার শাস্ত্র

দর্শন ও শাস্ত্রে প্রভেদ কি, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে কোন বিষয়ক কার্য্যকলাপের ঔচিত্যানৌচিত্য প্রদর্শনই দর্শনের উদ্দেশ্য।

আর সেই জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য হইবার জন্য যে সকল বিধি স্থিরীকৃত হয়, তাহাকেই বলে শাস্ত্র রাজা কি, রাজ্য কি, কিরূপে রাজ বা রাজ্যের সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, রাজা প্রজায় সম্বন্ধ কি, উহাদিগের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কিরূপ, রাজ্যের উন্নতি ও অবনতি কাহাকে বলে, কি কি উপায়ে রাজ্যের উন্নতি অথবা কিকি কারণে অবনতি হয়, এই সকল বিষয়ক জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচারই ব্যবহার দর্শনের উদ্দেশ্য। আর রাজ্য সৃষ্টি, রাজপ্রতিষ্ঠা ও রাজা প্রজার পরস্পর কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকেই ব্যবহারশাস্ত্র বলে। অর্থাৎ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চ্চাই ব্যবহার-দর্শনের কার্য্য, আর তদ্বিষয়ক প্রতিপাদ্য নিয়মাবলীই ব্যবহার-শাস্ত্র।

ব্যবহার দর্শনের লক্ষ্য রাজ্যের সুশাসনকল্পে সু-বিধি প্রণয়ন করা; আর ব্যবহার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যথা সাধ্য ব্যবহার দর্শনানুযায়ী সুনিয়মে রাজ্য শাসন করা, অর্থাৎ ব্যবহার দর্শন জনিত জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করা। এইজন্য সমস্ত ব্যবহার দর্শন শাস্ত্রে পরিণত হয়না, এবং এই জন্যই ব্যবহার শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিলেও দণ্ড ভোগ করিতে হয়। সমস্তটী ব্যবহার দর্শন শাস্ত্রে পরি-

গত করিলে, সে শাস্ত্র সাধারণে পালন করিয়া উঠিতে পারেনা, অপিচ ব্যবহার দর্শনের যে সকল উপদেশ পালনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যদি কেহ পালন না করে, অর্থাৎ সেই সকল বিধি লঙ্ঘন করিয়াও যদি দণ্ডিত না হয়, তবে ব্যবহার শাস্ত্রের কার্য্যকারিতার লোপ হয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার শাস্ত্রের হেতু ও উন্নতির মূল যে ব্যবহার দর্শন তাহার ও বিলোপ হইয়া জনসমাজ ভয়ানক অধঃপতন প্রাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষে দর্শনের সমুচিত আলোচনা হয় নাই। ভারতে দর্শন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, মনের বিকাশ-অর্থাৎ চিন্তা মেধা ও সদসৎ-বিচারশক্তির প্রখরতা না জন্মিলে দর্শনের আলোচনা দূরে থাকুক সৃষ্টিই হয় না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের মন অপেক্ষা হৃদয়েরই প্রবলতা অধিক। এই হৃদয়প্রবণতার কারণ অবধারিত করা সহজ নহে কোন কোন প্রবীণ লেখক সিদ্ধান্ত করেন, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা কেবল ভয় বিস্ময় ও স্নেহ মমতাদি ভাবোদ্দীপক; দেশের এই প্রাকৃতিক অবস্থা ভারতবাসীদিগের প্রকৃতিতে এই বিশেষত্বের হেতু। দেশের এই প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা ভারতবাসীদিগের অন্তরের কথঞ্চিত পরিবর্ত্তন সম্ভবে, কিন্তু একমাত্র

উহাই কারণ নহে। আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি, কোন কোন লোকের স্বভাবতই কোন কোন ভাবগতি প্রবল তখন একজাতি হইতে জাত্যন্তর যে স্বভাবতঃ হৃদয়প্রবণ হইতে পারেনা তাহা নহে অতএব আমরা অনুমান করি,—ভারতবর্ষীয়েরা সাধারণতঃ হৃদয় প্রবণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ; এবং জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বদেশের প্রকৃতি অনুসারে উত্তরোত্তর অধিকতর হৃদয়প্রবণই হইতে থাকে যাহা হউক এ সকল বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন, ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ধর্ম্ম ভীরু, এ দেশের লোকের যেমন ভক্তি এবং এ দেশের সাহিত্যাদি যেমন হৃদয়গ্রাহী এমন আর কোথাও নাই। এতদ্দারাই ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে বিশ্বাস, ভক্তি স্নেহ, বীরত্ব, ও সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি বৃত্তি গুলি সুতরাং তদাধার হৃদয় ভারতবর্ষীয়দিগের অতিশয় প্রবল। এই হৃদয়-প্রবণতাই এ দেশে দর্শন শাস্ত্রের সমুচিত আলোচনা না থাকিবার আদি কারণ। বহু বাক্য ব্যয় না করিয়া আমরা তিনটী মাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি। প্রথমতঃ দেখ, এ দেশে অসংখ্য বেদ উপনিষৎ শাস্ত্র পুরাণ ও সাহিত্যের মধ্যে দর্শন সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাহারও সকলই দর্শন আখ্যার উপযুক্ত নহে দ্বিতী-

যতঃ দেখ, অত্যুৎকৃষ্ট যে সাংখ্যদর্শন, যাহা পূর্ব্বকালে দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালেও অনেক দর্শনের আদর্শ, তাহা এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। অথচ উহারই প্রভাবে নানা দিগ্দেশের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির যুগান্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে কদাচিৎ কোন মনীষী ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অলৌকিক জ্ঞানবলে এদেশে এক একটী দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভারতবাসীরা দর্শনে বীতস্পৃহ বলিয়াই আবার এদেশে তাহা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে তৃতীয়তঃ দেখ, দর্শনের উপযুক্ত আলোচনা ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারেনা ও উহার উচ্চতা রক্ষিত হয় না যে দেশে দর্শনের উপযুক্ত আলোচনা আছে, সেখানেই ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এদেশে আসিবার সময় আর্য্যেরা যে বৈদিক ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিলেন, অথবা ভারতে আসিয়াই যাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এদেশে ধর্ম্মের জন্য বহু চেষ্টা হইয়াও ধর্ম্মোন্মত্ততার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াও, অসংখ্য সম্প্রদায় জন্মিয়াও তাহার দিন দিন অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় নাই। একমাত্র দর্শনের আলোচনার অভাবই ইহার কারণ।

ভারতে ব্যবহার দর্শন।

ভারতে ব্যবহারদর্শন নামে কোন দর্শন নাই। মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদিতে রাজা প্রজার কর্ত্তব্য বিষয়ে ভাল ভাল উপদেশ আছে বটে, এবং রাজ্যশাসন, জন্য রাজা প্রজার পালনীয় ব্যবস্থা সংহিতাদিতেও আছে বটে, কিন্তু ব্যবহার বিষয়ে দর্শনাকারে কোন গ্রন্থ নাই। ব্যবহার দর্শনের মূল ব্যক্তিত্ববোধ, সমষ্টিত্ববোধ ও সহানুভূতি বোধ ভারতের সামাজিকভাব দিকে দৃষ্টি করিলে ইহার একটীও দেখা যায়না। ব্যক্তিত্ববোধ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কতক গুলি স্বতঃসিদ্ধ অধিকার আছে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত বা বঞ্চিত করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এই বোধ। সমষ্টিত্ব বোধ অর্থাৎ সেই প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, তাহার উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং এইরূপ কতক গুলি ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ, এইবোধ আর সহানুভূতি বোধ অর্থাৎ সমাজের এক ব্যক্তির অবনতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্যের ও অবনতি; কেহই পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না, এই বোধ। ভারতের সমাজিকতায় এই তিনটী বোধ নাই। ইহার এক বিশিষ্ট শাস্ত্র ... ভারতের জাতিভেদ প্রথা। ভারতের জাতিভেদ এবং তা... বলিতেছে,—ঐ যে শূদ্রতনয়, উহার শাস্ত্রচর্চ্চায়

অধিকার নাই, যুদ্ধ বিদ্যায় অধিকার নাই, বাণিজ্যে অধিকার নাই; এখানে ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকার যে—যে কোন রূপে আত্মোন্নতি করা—তাহার উপরে খড়্গাঘাত করা হইল। যে শূদ্র হইবে, সে দাসত্ব করিয়া অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বর্ণ দিগের প্রয়োজন ও সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবে ভিন্ন অন্য প্রকার আত্মোন্নতি ও সমাজের হিতসাধন করিতে পারিবে না। যে সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে (প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সমাজের মঙ্গলার্থ প্রয়োজিত হইবে, সমাজও তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দ ও উন্নতিকল্পেই সংস্থাপিত হইবে; ইহ স্বীকার করে) সে সমাজে এরূপ নিষ্ঠুর স্বার্থপর বিধি স্থান পায় না। দ্বিতীয়তঃ মনেকর, ভারতের নিয়ম এই—যুদ্ধকালে ক্ষত্রিয় মাত্রই অস্ত্রধারণ করিবে; আর কেহ পারিবেনা। যখন ভারতের প্রজা সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষত্রিয় সংখ্যা এমন কম হইয়া পড়িবে যে তখন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় অস্ত্র ধারণ করিবার অধিকারী হইলে রাজ্যে সৈন্যবল নিতান্ত ন্যূন হইয়া পড়িবে এবং সেই সময়ে কোন আকাস্মিক বিপদ হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে হইলে যদি কোন বৈশ্য অস্ত্রধারণ করিতে না পারে; তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে যে, ভারতসমাজ সমাজের সমষ্টিত্ব বুঝিতে পারিল

না। কেননা, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে সমাজের অঙ্গ, প্রযোনজন মাত্রেই যে সে সমাজের কোন কার্য্য সাধন করিতে অধিকারী ও করিতে বাধ্য, এ কথা বুঝিতে পারিল না। তৃতীয়তঃ মনে কর, নিকৃষ্ট বর্ণের লোকেরা জ্ঞানানুশীলন করিলে তাহাদের অবস্থা উন্নত হয়, এবং তাহা হইলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবশ্যম্ভাবী; একথা বুঝিতে না পারাই সহানুভূতি না বুঝা ভারতসমাজ ইহা বুঝিতে পারে নাই

ভারতে ব্যবহার দর্শনের অনুশীলন না থাকিবার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে,এখানে ব্যবহার-দর্শনানুযায়ী রাজ্য ছিলনা। ব্যবহার-দর্শনের আলোচনা থাকিলে ঐরূপ রাজ্য না থাকিয়া পারিত না ইউরোপখণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহারদর্শনের আলোচনা যথোপযুক্ত রূপে না হইলেও এইক্ষণ ক্রমে ক্রমে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত রাজপদের বিলোপ হইয়া ব্যবহারদর্শনানুযায়ী শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইতেছে। কোথাও বা রাজ নাম মাত্র অবশিষ্ট, কার্য্যতঃ প্রজাশক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা

ভারতে বাজনীতি ও রাজব্যবস্থা

ভারতে ব্যবহার দর্শনের আলোচনা না থাকিলেও রাজনীতির চমৎকার উন্নতি হইয়াছিল ব্যবহার দর্শনের সমুচিত অনুশীলন ছিলনা বলিয়া এ-

দেশে সমস্ত বিষয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত ভারতবর্ষের রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার। ভারতবর্ষীয়েরা মনে করিত, নরলোকে প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন সংরক্ষণের জন্যই দেবতারা রাজা নামে এক মহাপুরুষকে প্রেরণ করেন, তিনি চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত নরেশ্বর, অথবা মনুষ্য-শরীরধারী প্রেরিত দেবতা এই রূপে রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের পুত্র ও বিক্রমাদিত্য দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রত্যুত এদেশীয়েরা বিশ্বাস করিত যে রাজা একাধারে মনুষ্য ও দেবতা। এই জন্য তাঁহার প্রতি দ্বিবিধ কর্ত্তব্যসাধনে যত্নপর হইত। মনুষ্য জ্ঞানে করাদি দানে তাহার অভাব পূরণ করিত; আর দেব জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি করিত এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত তাঁহার ব্যবহারে প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হইলেও কিছু বলিবার অধিকার পাইত না। এমন কি রাজ্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও প্রজাবর্গ মনে করিত, প্রেরিত পুরুষের ত্রুটিতেই দেবতারা বিরক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সংঘটন করিতেছেন, রাজাও তাহাই বিশ্বাস করিয়া হোম দান প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া স্বকীয় পাপক্ষালনে ত্রুটী করিতেন না। বাস্তবিক ভারতবর্ষে রাজা ও প্রজার মধ্যে ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিরাজ করিত।

ভারতে রাজাপ্রজার মধ্যে উপাস্য‌উপাসক ও রক্ষক রক্ষিতের সম্বন্ধ ছিল। এইজন্যই ভারতবাসীরা রাজাকে ধর্ম্মাবতার ও বিচারালয়কে ধর্ম্মাধিকরণ বলিত; এবং রাজাও সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম মনে করিতেন। এই সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য রাজা প্রজার কর্ত্তব্য বিষয়ে কতকগুলি নীতিকথার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকেই বলি ভারতে রাজনীতি। সে সমুদয় নীতির অনেকই যদিও ব্যবহার দর্শনানুসারে প্রশিষ্ট নহে, তথাপি উহার অনেকেরই এমন গভীর ও উচ্চ ভাব যে পাঠ মাত্রে আনন্দ জন্মে, এবং উহাতে চিন্তাশীলতারও বিলক্ষণ পরিচয় আছে।

ভারতবর্ষে যে সকল সংহিতা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে মনুসংহিতা প্রধান। এই সকল সংহিতা (আইন) ব্যবহার দর্শনানুযায়ী নহে। উহারাও উল্লিখিত রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া, রাজনীতির উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই রচিত হইয়াছে। অতএব উহাদিগকে ব্যবহার সংহিতা না বলিয়া রাজব্যবস্থা বলাই সুসঙ্গত। কেন না ব্যবহারসাস্ত্রের (সংহিতার) যে উদ্দেশ্য ব্যবহার দর্শন অক্ষুণ্ণ রাখা, ঐ সকল গ্রন্থে রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজামাত্রেরই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া, রাজাকে

ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে উপদেশ দিয়া এবং ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে

ব্যবহার দর্শনের আলোচনা ভাব।

আজ কাল উদার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এ দেশে দর্শনাদির কথঞ্চিত আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে উচ্চশিক্ষা এবং উদার শিক্ষার পথ প্রচলিত থাকিলে আমরা ভরসা করিতে পারি, কালে এদেশেও দর্শনাদির বিলক্ষণ অনুশীলন হইবে, এবং এদেশীয়েরাও ব্যবহার দর্শনের আলোচনায় আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইবে। এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী অতি নিন্দনীয়, এবং ঐ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অতি নীচ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এদেশীয়েরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে এদেশে অচিরেই দর্শনাদির বিস্তর আলোচনা হইতে পারে এদেশীয়দিগের সাধারণ জ্ঞান এই যে, কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করা এবং স্বকীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে জ্ঞানবৃদ্ধি, চরিত্রসংগঠন অর্থাৎ আত্মোন্নতি এবং সমাজের উন্নতি, এদেশীয়েরা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াই বিদ্যা শিক্ষা করিতে

প্রবৃত্ত হয়। এদেশীয়েরা শিক্ষার গৌণ ফল যে অর্থোপার্জ্জনাদি, তাহা সাধন করিবার জন্যই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করে, জ্ঞান শিক্ষা করে না। এদেশে যে ছাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছে, অভিনিবেশ সহকারে তাহার আচার ব্যবহার বুদ্ধি শুদ্ধি ও মনের বিকাশ কি হৃদয়ের ভাবস্ফূর্তি প্রত্যক্ষ কর, তাহাকেও নিশ্চয়ই সর্করাবাহী বলীবর্দ্দসদৃশ বোধ হইবে। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে বাহ্যিক সুখ স্বচ্ছন্দের কি অর্থোপার্জ্জনের আপাতঃপ্রতীয়মান কোন সম্পর্ক নাই; অপিচ জ্ঞান শিক্ষায় অধিকতর অভিনিবেশ ও পরিশ্রমের আবশ্যকতা, তাহাও আবার এদেশীয় দিগের স্খলিত প্রকৃতির নিকট নিতান্তই নীরস তাই এদেশে শাস্ত্রের যে কিছু চর্চ্চা হইতেছে, দর্শনের নহে। এদেশে বর্ষে বর্ষে বহু সংখ্যক লোক ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিচারালয় পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহারা উকীল নামে পরিচিত, এবং আপনাদিগকে অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ মনে করিয়া স্ফীত বটে;কিন্তু উহাদিগের বিজ্ঞতার সীমা অত্যল্প দূরব্যাপী। উহারা পূর্ব্ব প্রচলিত ভারতবর্ষীয় রাজব্যবস্থার কতক কতক অবগত আছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের

রাজবিধির অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কিরূপ যুক্তির উপর ঐ সকল ব্যবস্থা সংস্থাপিত তাহা এবং ঐ সকল ব্যবস্থার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারে অক্ষম। উকিল জানিতেছে, দায়ভাগানুসারে কোন হিন্দু লোকান্তরিত হইলে তাহার পুত্রেরাই তদীয় বিষয়াধিকারী হয়। কিন্তু কন্যাগণকে উপেক্ষা করিয়া পুত্রদিগকে এই উত্তরাধিকার প্রদানের যুক্তি কি, সে যুক্তি ন্যায়ানুমোদিত কি না; এবিষয়ে তাহার জ্ঞান নাই। ইংলণ্ড দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, এ দেশে পুত্রেরা সকলেই সেই অধিকার প্রাপ্ত হয়, কি কি যুক্তির উপরে এই দুই বিপরীত বিধি সংস্থাপিত, উকীল তাহা অবগত নহেন; অথবা এই দুই বিধির মধ্যে কোন্‌টী প্রশস্ত, উকীল তাহার মীমাংসাও করিতে পারিবেন না। এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া লঘু দণ্ড ভোগ করিতেছে, অথচ প্রতিষ্ঠিত রাজপদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে কেন, এরহস্যের মর্ম্মভেদ করা প্রস্থকাট উকীলের সাধ্যাতীত।

পরন্তু এতদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীও যার পর নাই নিন্দনীয়। এই শিক্ষাপ্রণালীতে

বিদ্যার্থীর্দের সকল ছাত্রকেই সকল বিষয়ে দন্তস্ফুট করিতে হইবে। সমুদয় বিষয় এক ব্যক্তির উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করা অসম্ভব। উহাতে মাত্র পল্লবগ্রাহীতা লাভ হয় অবশ্যই সাধারণ জ্ঞানলব্ধ হওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করিতে হয়, অন্যথা অনেককেই "পণ্ডিত মূর্খ" হইতে হইবে। কিন্তু অতঃপর প্রত্যেকের বিষয় বিশেষ অধ্যয়ন করা শ্রেয়ঃ ; না হইলে অধিকক্ষণ মনঃ সংযোগের সময় থাকেনা। অথচ এতদ্ভিন্ন দর্শনের উপযুক্ত অনুশীলনও অসম্ভব। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, এদেশে যাহারা অল্প কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং আপনাদিগের শক্তি ও রুচি অনুসারে বিষয় বিশেষে মনঃ সংযোগ করিয়াছে, তাহাদিগের অনেকেই পণ্ডিত হইয়াছে ; অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা অনেকেই বিজ্ঞতাশূন্য অনেক কাল এরূপ পল্লবগ্রাহীতা অভ্যাস করিলে শেষে এই এক শোচনীয় অবস্থা দাড়ায় যে, বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ করা দুরূহ হইয়া ওঠে।

দর্শনও শাস্ত্রের বিভিন্নতা ও সম্বন্ধ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

ব্যবহার দর্শনে জ্ঞা া না

হইয়াছে তদ্দ্বারাই একথা হৃদয়ঙ্গম

জন্মিলে ব্যবহার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

হইতে পারে, যে ব্যবহার দর্শনে জ্ঞান না জন্মিলে ব্যবহার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অসম্ভব। বস্তুতঃ ব্যবহার দর্শনে যে সকল যুক্তির অনুশীলন হইয়াছে, ব্যবহার শাস্ত্রও সেই সকল যুক্তির উপরেই সংস্থাপিত। এরূপ অবস্থায় ব্যবহার শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা অবগত হইতে পারা যায়, সমগ্র ব্যবহারশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াও রাখা যায়, কিন্তু ঐ সকল বিধি ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা অথবা সেই শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই জন্যই এদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল লোক ব্যবহারবিদ নামে পরিচিত, তাহাদিগের অনেকেই প্রচলিত অনেক ব্যবহার শাস্ত্রের যৌক্তিকতা কি অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম, এমন কি অনেক স্থলে ব্যবস্থা বিশেষের মর্ম্মও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। মনে কর, ব্যবহার দর্শনের উপদেশ এই যে—বিশেষ কোন দুর্ঘটনা অথবা বিপদ বিগ্রহের সময় ভিন্ন স্বাধীন বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া উহার উন্নতির প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ঐরূপ করিলে জাতীয় উন্নতির প্রতিরোধ করা হয়। এই উপদেশের মর্ম্ম যিনি না বোঝেন, তিনি বৈদেশিক পণ্যের উপরে শুল্ক সংস্থাপন করিয়া স্বদেশের রাজকোষ

পূরণ করিবার ব্যবস্থাকেই অত্যুৎকৃষ্ট মনে করিবেন। এমন কি কেহ তদ্রূপ ব্যবস্থার অনৌচিত্য প্রদর্শন করিলেও তাহাকে স্বজাতির শত্রু মনে করিয়া বিদ্বেষ করাও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে. এদেশে সিবিল্ ম্যারেজ নামে বিবাহ বিষয়ে যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, অনেকেই তাহাতে স্বয়ম্বর বিবাহের বিধি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন ; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার বিধিটী না থাকিলে যে ঐ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থাকে, এদেশের অনেকেই একথা অদ্যাপি বুঝিতেছেন না ব্যবহার দর্শনের অনুশীলনের অভাবে আমরা সময়ে সময়ে অতি উপহাসাস্পদ ঘটনা ও প্রত্যক্ষ করি "এক ব্যক্তিকে গুরুতর প্রহার করিয়া কোন ব্যক্তির মাত্র ত্রিংশৎ মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল, অথচ অপর ব্যক্তি এক খানি ব্যবহৃত ডাক ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিযাছে বলিয় তাহার দুই মাস কারাবাসের ব্যবস্থা হইল " এটী নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া এদেশের কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদককেও অনুযোগ করিতে শুনা গিয়াছে। ব্যবহারদর্শনে অজ্ঞতাই এবম্বিধ প্রমাদের কারণ। এস্থলে এতদুভয় অপরাধ মধ্যে কোন্‌টী গুরুতর, তদ্বিষয়ে কিছু না বলিয়া পাঠকের বিচারার্থ রাখা গেল

ব্যবহার দর্শনানুশীলনের ফল

দর্শন মাত্রেরই অনুশীলনে সুমহৎ ফলোৎপন্ন হয় উহাতে বুদ্ধি মার্জিত হয়, বিচার শক্তি প্রখর হয়, এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা পায়, সুতরাং দুর্ব্বলতার স্থলে সবলতা জন্মে; আর উত্তরোত্তর অধিকতর জ্ঞান লাভ করিয়া সুবিধি সংস্থাপন পূর্ব্বক বলের কার্য্য কৌশলে এবং অসম্ভব সম্ভব করা যায়। ব্যবহারদর্শনানুশীলনের কয়টী বিশেষ উপকারিত্ব আছে, তাহা এই—ব্যবহার দর্শনানুশীলনের ১ম উপকারিতা একতার আবশ্যকতা-বোধ। ব্যবহার দর্শনের প্রথম জ্ঞান ব্যষ্টিত্ব ও সমষ্টিত্ব বোধ। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিত্ব স্বীকার না করিলে সমাজসংস্থাপন হয় না, অথচ সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি না হইলেও সমাজ হয় না এই বোধ ব্যবহার দর্শন বলিতেছে, কতকগুলি গুণী জ্ঞানী আঢ্য লোক ও পরস্পার বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিলে তাহাতে সমাজ হয় না একটী সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলে, কতকগুলি লোকের শক্তি সামর্থ্য একত্র করিয়া একটী সাধারণ শক্তি করিতে হইবে, সেই সুতরাং প্রবল সাধারণ শক্তির প্রভাবে সমাজিকের —সমাজের আবশ্যকীয় শ্রমসাধ্য ও গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন অথচ সেই শক্তিরই সদ্ব্যবহার

করিয়া সমাজের অভ্যন্তর সুশৃঙ্খলে রাখিবেন। এইরূপে অন্তরে বাহিরে সমাজের উন্নতি করিবেন। কতকগুলি লোক যদি এই ভাবে মিলন দ্বারা বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একীভূত করিয়া প্রবল হইবার জন্য এবং সেই প্রবল শক্তির অনুশাসনে ব্যক্তিগত অসদ্ব্যবহার নিরাকরণ জন্য একত্র হয়, একমত ও এক বাক্য হয়; তাহাকেই বলি প্রকৃত একতা। ব্যবহার দর্শন এই একতাই শিক্ষা-দেয়। দুরবস্থা হেতু কতকগুলি লোকের চিত্তের সাময়িক উত্তেজন বশতঃ যে একরূপ ভাব গতি হয় তাহাকে একতা বলে না। ঐ রূপ উত্তেজনা পরম্পরায় একতার আবশ্যকতা অনুভূত হয় মাত্র।

ব্যবহারদর্শনানুশীলনের দ্বিতীয় ফল আত্মশাসন শিক্ষা। ব্যবহার দর্শন বলিতেছে, যে যদি সামাজিক হও, তবে যে কোন কার্য্য কর, সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে কর অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ দুঃখ যেন অনন্যগত, যে তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বকীয় মঙ্গল প্রত্যাশা করিলে তোমাকে এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে সমাজেরও মঙ্গল হয়। সমাজের ক্ষতি করিয়া স্বার্থপর হইয়া তুমি কোন কার্য্য করিলে আশু তোমার তাহা মঙ্গলপ্রদ বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতেই তোমার

পরিণামে বিষম অমঙ্গল হইবে। আজি যদি তুমি প্রতি-বেশীদিগের উপর অত্যাচার কর, চিরদিনের জন্য তাহা-দিগের ভালবাসায় বঞ্চিত হইবে। হয় তো কালি তাহারা তোমার উপর প্রতি-অত্যাচার করিবে; তুমি একাকী যাহা করিয়াছিলে, তাহারা সকলে তাহার দ্বিগুণ করিবে; আবশ্যক হইলে সমাজশক্তি তোমাকে পেষণ করিবে। যদি তুমি স্বজাতিস্থ নিম্নশ্রেণীর লোক-দিগের শিক্ষা সৌভাগ্যের পথ অবরোধ কর, এবং ঐরূপ করিয়া তাহাদিগকে আপনার অনুগত করিয়া রাখিতে চাও, কিম্বা কোন প্রকারে অর্থ শোষণ করিয়া সম্পন্ন হইতে চাও, তবে সেই সকল লোক উন্নত হইলে তাহাদিগ হইতে তুমি যে সুখ ও সদ্ব্যবহার লাভ করিতে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। সেই সকল লোক একদিন হয় তো দস্যুতা করিয়া তোমার সর্বস্বাপহরণ করিতে পারে। সেই সকল অনুন্নত লোকের সংসর্গে তোমার পুত্র পৌত্রাদি এমন অসচ্চরিত্র হইতে পারে, যে তোমার বহু যত্নের সঞ্চিত সম্পত্তি দিনকয়ের মধ্যে অপব্যয় করিয়া ফেলিবে, অথবা সেই সম্পত্তি লইয়া আত্মকলহ উপ-স্থিত করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে; অথবা তুমি যে প্রতিপত্তির জন্য এত লালায়িত ছিলে, সেই প্রতি-পত্তিস্থলে কলঙ্কসাগর খনন করিবে।

কোন স্বাধীন রাজ্যের কোন প্রজা উন্নতপদ লাভের আশায় অথবা ধনরাশি লাভ করিয়া যদি শত্রুকে স্বদেশ জয়ের সন্ধান প্রদর্শন করে, স্বদেশ পরাধীন হইলে সেই উন্নতপদ লাভ করিয়াও তাহাকে পরপদসেবা করিতে হইবে, অথবা সেই ধনরাশি দ্বারাও তাহাকে পরের পরিচর্য্যা করিতে হইবে পরন্তু সেই পদ অথবা সেই ধন তাহাকে প্রাপ্তিমাত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হওয়াও বিচিত্র নহে, অধিকন্তু তাহাকে, তাহার বংশধর ও আত্মীয় বর্গকে চিরদিন জাতীয় বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে হইবে; তাহাকেও নীচ বলিয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়েরই নিকট এবং ভবিষ্যতে ইতিহাসে নিন্দিত হইতে হইবে ব্যবহার দর্শনই মনুষ্যকে এই সকল দূর দৃষ্টি শিক্ষা দেয়, এবং এইরূপে সমাজিককে তাহার প্রকৃত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে। এই জ্ঞানের আলোচনায় মনুষ্য স্বার্থপরতা হইতে বিরত হইয়া সৎভাবে কার্য্য করিতে ও সেইরূপ কার্য্য করিয়া সমাজের সুতরাং আপনার অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল সাধনে সক্ষম হয়।

ব্যবহারদর্শনানুশীলনের তৃতীয় ফল উদারতা শিক্ষা। কতকগুলি লোকের সমষ্টিই সমাজ লোক মিত্রেরই রুচি প্রবৃত্তি বিভিন্ন, এবং সকল লোকের শক্তি

সামর্থ্য বিদ্যা বুদ্ধির যখন তারতম্য থাকিবেই থাকিবে, তখনই সামাজিক মাত্রেকেই উদার হইতে হইবে। প্রত্যেক লোকই আপনার রুচি ও মত পোষণ করুক, ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে হয়; অথচ সকল লোকই যদি বিভিন্ন মার্গাবলম্বী হয় তবে সমাজের অস্তিত্বই থাকেনা। অতএব যাহাতে সমাজ উৎসন্ন হয়, সেরূপ কার্য্য করিতে না দিয়া সমাজের প্রত্যেক লোককেই আপন আপন মত ও রুচির অনুসরণ করিতে দেওয়াই প্রকৃত উদারতা। ব্যবহার দর্শন এই উদারতাই শিক্ষা দেয়। এবং এই উদারতাই সমাজের সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। এই উদারতার উপদেশেই সমস্ত ব্যবহার দর্শন কস্মিন্ কালেও ব্যবহার শাস্ত্রে পরিণত হয় না। অনেকে উদারতার প্রকৃত অর্থ অবগত নহে। "যে যেরূপ করে করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তাহাতে আমার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই," এই তাহাদিগের কাল্পনিক উদারতার মূল মন্ত্র এই উদারতার ছলনায় তাহারা প্রতিবেশী পাপপরম্পরা উপেক্ষা করে, সহোদরের অসৎপথাশ্রয়ের প্রশ্রয় দেয়। বাস্তবিক উহা উদারতা নহে, উহার নাম

ঔদাসীন্য ভাবুকতার চক্ষে উহাকে সদ্ব্যবহার বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা প্রত্যবায়। ফলতঃ ব্যবহার দর্শনের অনুশীলন ভিন্ন সমাজের রক্ষাবন্ধনী স্বরূপ উদারতার তৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সুকঠিন।

ভারতে ব্যবহার দর্শনের অনুশীলনের একান্ত আবশ্যকতা।

যদি একতার অভাবই ভারতবর্ষীয়দিগের অধঃপতনের কারণ হয়, তবে এদেশে সর্ব্বাগ্রে ব্যবহার দর্শনের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অনৈক্যে ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে স্বর্ণভূমি ভারত দেখ একতার অভাবে মরু-ভূমি. ঐ দেখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটী জলস্রোত মিলিত হইয় বেগবতী স্রোতস্বতীর জন্ম হইল, পুনরায় দেখ সেই স্রোতস্বতী পঞ্চধারায় বিভক্ত হইল কি ক্ষীণ রেখায় পরিণত হইল, আর তাহার সে বেগ সে তরঙ্গ রহিল না। ভারতে একতা নাই, ভারত সমাজের জীবন নাই, ভারতের সৌভাগ্যের আশা নাই!

আজি কালি স্বদেশে একতা একতা করিয়া একটা ধ্বনি উঠিয়াছে কিন্তু হায়! যাহারা সেই ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি করিতেছে, তাঁহারাও একতার তাৎপর্য্য বুঝিতেছে না। প্রভু তোমার উপর অত্যাচার করিতেছেন, আমার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তাহার

উপরও অত্যাচার করিতেছেন। তুমি, আমি সে সকলেই প্রভুর উপরে চটিয়াছি; চটিয়া কটূক্তি করিতেছি, একই স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছি; ইহা একতা নহে যখন দুঃখের অবস্থা চলিয়া যাইবে, তখন তুমি, আমি সে কাহাকেও কেহ চিনিব না অথবা এই যে এক স্বরে রোদন করিতেছি, ইহার মধ্যেও অবকাশ মাত্রে আমি তোমাকে পীড়ন করিতে বা বিদ্বেষ করিতে ছাড়িতেছি না। ভারতের বর্ত্তমান একতা সেই একতা। ইহার নাম একাবস্থা। তবে এই একাবস্থায় একতার মূল্য বুঝাইয়া দিতে পারে, কিন্তু হায় ভারতের ভাগ্যে সে দিন কবে ঘটিবে, কে বলিতে পারে! ব্যবহার দর্শনই প্রকৃত একতা শিক্ষা দেয় ব্যবহার দর্শন বলে, একতাই সমাজের প্রাণ। সদ্ভাবে বল, আর অভাবে বল, একতা ভিন্ন সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। একতা ভিন্ন সমাজই হইতে পারে না। তুমি ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না, আমি ভিন্ন তুমি বাঁচিতে পার না; তুমি আমি ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না ইহাই প্রকৃত একতা, এই একতা ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এই একতা ভারত সমাজে নাই। না হইলে কি এমন হয়—তুমি মাগধক্ষেত্রেই কর্ষণ করিতেছ, সে উড়িয়া শিবিকাই

বহন করিতেছে, আর আমি বাঙ্গালি পরপদসেবাতেই কৃতার্থ. বিংশতি গাছি তৃণ একত্র হইলে প্রবল রজ্জু প্রস্তুত হয়, আর আমরা ভারতের বিংশতি কোটী লোক কেহ কাহাকে চিনিলাম না।।

আত্মশাসন-শিক্ষা ব্যবহার দর্শনানুশীলনের দ্বিতীয় ফল। আত্মশাসনের নামান্তর চরিত্রসংগঠন, অর্থাৎ স্বার্থপরতা ও নীচতা পরিহার করিয়া এরূপ সচ্চরিত্র হওয়া, যাহাতে আপনার এবং সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে। ভারতের বর্ত্তমান হীনাবস্থায় ভারত বাসীদিগের চরিত্র এমন উচ্ছৃঙ্খল, ভারতবাসীরা এই ক্ষণ এরূপ স্বার্থপর, যে সমস্ত ভারতসমাজে এইক্ষণ এরূপ কয়টী লোক অনুসন্ধান করিয় পাওয়া সুকঠিন হইবে, যাহাদিগের উপরে সমাজের কি স্বদেশের মঙ্গলের ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক যায়। ভারতবর্ষীয়েরা এই ক্ষণ কেবল স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করিতেই কৃতসংকল্প। এরূপ হইবার দুই কারণ, এক ধর্ম্ম জ্ঞানের ও দ্বিতীয়তঃ ব্যবহার দর্শনালোচনার অভাব দায়ীত্ব চরিত্র সংগঠনের এক প্রধান কারণ যাহার উপর যে বিষয়ের যত দায়ীত্ব, সে সেই বিষয়ে তত সাবধান। ব্যবহার দর্শন

সমাজের জন্য প্রত্যেক সামাজিকের সেই দায়ীত্ব বুঝা-ইয়া দেয় যদি ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিত, যে প্রত্যে-কের আচার ব্যবহার ও চরিত্রের সঙ্গে সমাজের ইষ্টানিষ্টের অতি ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ; যেই যাহা করিবে তাহাতেই সমাজের ভাল মন্দ ঘটিবে, এবং তাহাকেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তাহাইহলে আর তাহারা এরূপ স্বার্থপর হইতে পারিত না। তাহা হইলে সৎকার্য্যে উৎসাহশালী ও অসৎকার্য্যে নিরস্ত হইত। আমি অকাতরে যে কার্য্যটী করিতে পারি। যদি বুঝিতে পারি, তাহাতে স্বদেশের ক্ষতি হইবে, স্বজাতির কলঙ্ক হইবে, তাহা হইলে আর সেই কার্য্য তত অকুণ্ঠিত চিত্তে করিতে পারিব না, এটী মানুষের স্বভাব।

অনুদারতা ভারত সমাজের গুরুতর কলঙ্ক ইংরে-জীতে উদারতাকে Toloration টলারেসন বলে। ধর্ম্মকর্ম্মে বল, বিষয় কর্ম্মে বল, ভারতে উদারতা ছিলনা। সেই অনুদারতার বিষময় ফল জাতিভেদ, ও ভিন্ন দেশীয়দিগের সঙ্গে সংস্রবের লোপ। কোন জাতির উদারতাকে আমরা দুই সংজ্ঞা প্রদান করি,—অন্তরুদারতা ও বহিরু-দারতা। স্বজাতীয়দিগের মধ্যে পরস্পর উদার ব্যব-হারকে অন্তরুদারতা ও বৈদেশিকদিগের সঙ্গে উদার

ব্যবহারকে বহিরুদারতা বলি। কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি এই দ্বিবিধ উদারতা আশ্রয় করিয়াই হয়। অন্তরুদারতায় সমাজের অভ্যন্তরভাগ সজীব থাকে প্রত্যেক ব্যক্তি দোষী হইলেও সেই দোষে চিরকাল দণ্ডনীয় থাকিলে, উচ্চতর অধিকার পাইয়া উন্নত ও সংস্কৃত হইতে না পারিলে তাহার আর যেমন বাঁচিবার আশা নাই; তাহাদ্বারাও ক্রমে ক্রমে সমাজের অপকার ভিন্ন উপকারের প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু যদি সমাজের প্রত্যেক লোক ও প্রত্যেক শ্রেণী এইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাদ্বারা সমাজের যে অঙ্গ শুকাইয়া যায় সে অঙ্গের পূরণ অথব সাহায্য সম্ভবে। এইরূপে সমাজের অভ্যন্তর ভাগ সজীব থাকিয়া যে উন্নতি হয়, তাহাকে বলে স্বকীয় অথবা মৌলিক উন্নতি। আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে আচার ব্যবহার ও শাসন প্রণালীর বিনিময়ে যে উন্নতি হয়, তাহাকে বলি সংক্রামিত উন্নতি। ভারত এই উভয় বিধ যথার্থ উন্নতিতে বঞ্চিত ছিল। ভারতের আভ্যন্তরিক অনুদারতায় যে ব্যক্তি অপকর্ম্ম করিয়া চণ্ডাল হইয়াছে, সে কেন চিরদিনের জন্য তাহার বংশধরেরাও চণ্ডালই রহিয়াছে; আর তাহার প্রায়-

শিতত্ব নাই, আর তাহাদ্বারা সমাজের অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণের আশা নাই। ভারতে এই বিষময় আভ্যন্তরিক অনুদারতায় শূদ্র মুনির শিরশ্ছেদ হইয়াছিল! বহিরনুদারতায় ভারতবাসী সিন্ধুনদ পার হইতে পারেনাই। ভারতের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে এক ভাষা এক ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিয়াও পরস্পর ঘনিষ্টতা ছিলনা,—পরিচয়ও ছিলনা।

আজকাল কল্পিত স্বদেশানুরাগ অথবা বৃথা অভিমানের এদেশে এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে ভারতে কোন বিষয়ের অভাব ছিল, একথা বলিতে ভয় হয়; শুনিলে অনেকে খড়্গহস্ত হইবে সন্দেহ নাই অনেকে হয়ত বলিতে পারেন,—"এই যে তুমি অনুদারতার অপরাধে ভারতকে অপরাধী করিতেছ, বল দেখি ভারতের কি এক কালে বিপুল উন্নতি হইয়াছিলনা?" মানিলাম, এক কালে ভারতে বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। কাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভারতের উন্নতির এ গৌরব? ভারতবর্ষীয়েরা অতি প্রাচীন জাতি। ঐ যে বৎসর কতিপয় হইল একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কি এ উন্নতির তুলনা সুসঙ্গত? চীনেরাও প্রাচীন জাতি, মিশরেরাও প্রাচীন জাতি। তুমি কি

বলিতে পার, চীন ও মিশর অপেক্ষা ভারতের উন্নতি অধিক হইয়াছিল? মিশরে চীনে ও ভারতে একরূপ অনুদারতা ছিল, তাই ইহাদিগের উন্নতিও দেখ ঐকরূপ। আর দেখ, কত দীর্ঘকালে এ সকল দেশের ঐ উন্নতি হইয়াছিল। আমি বলি, উদারতার প্রভাবে ইদানীন্তন জাতি সমূহ যেরূপ সে দিন মাত্র ভূগর্ত্ত হইতে উঠিয়া বিপুল উন্নতি করিয়াছে, ভারতের উন্নতি এমন দ্রুতগামী ছিল না। ইহাও অনুদারতার দোষ। পরন্তু কোন দেশের উন্নতি বলিলেই বুঝিতে হইবে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের অবস্থা কতদূর উন্নত। দুই চারি ব্যক্তি অথবা শ্রেণী বিশেষের উন্নতিকে দেশের প্রকৃত উন্নতি বলিতে পারি না। উহা আংশিক উন্নতি এবং স্থায়ী উন্নতি নহে, ইহাও অনুদারতার ফল। ভারতে এইরূপ উন্নতিই বর্ত্তমান ছিল। ইহাকে ভারতের উন্নতি না বলিয়া ভারতে অনেক বিষয়ের উন্নতি বলা উচিত। কেবল ভারতে নহে চীনেও ছিল মিশরেও ছিল, প্রাচীন জাতি মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই অনুদারতা ছিল। কিন্তু যতদূর জানা যায়, তাহাতে ভারতবর্ষই অধিকতর অপরাধী। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, যদি এই অনুদারতা না থাকিত, ভারতের শিরস্থানীয়েরা

শাস্ত্রকারেরা ও শাসনকর্ত্তারা যদি সাধারণ লোকের জ্ঞান বুদ্ধির উন্নতি করিয়া সমাজের উন্নতি করিতে চাহিতেন, যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে এরূপ জাতীয় বিদ্বেষ না রাখিতেন, তবে ভারতে যেরূপ শিল্প সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল, নিশ্চয়ই এ দেশে সর্ব্বাগ্রে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইত; এদেশীয়েরা যেরূপ রণ নিপুণ হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই অযোধ্যা বা ইন্দ্রপ্রস্থ রোমের মত সমগ্র পৃথিবীর রাজধানী হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়। সকলের বিনাশ করিয়াছে অনুদারতা, আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের মূল ধ্বংশ করিয়াছে অনুদারতা, আমাদিগের অদৃষ্টের পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিল সেই নিষ্ঠুর অনুদারতা। ইহা ভারতের অদৃষ্টের দোষ। কাহারও দোষ কাহারও দুঃখ চিরদিন থাকে না। আর্য্য রাজ্যে এত দীর্ঘকাল অনুদারতায় ভারতের মর্ম্ম গ্রন্থিতে আঘাত করিয়াছে। তাহার পর যবনাধিকার; তাহাতেও আবার বিষম অনুদারতা! ভারতবাসী উদারযুক্তা শিক্ষা করিবে কোথা? আপনি শিক্ষা করিল না, শাস্ত্র শিক্ষা দেয় না, শাসনকর্ত্তা শিক্ষা করায় না; ভারতবাসী উদারতা শিক্ষা করিবে কোথা? কোন্ দিন ভারতের ঘরে ঘরে ব্যবহার, দর্শনের আলোচনা, হইবে, ভারতবাসী সমাজতত্ত্বের

আলোচনা করিবে, উদারতার মর্ম্ম বুঝিয়া পরস্পরকে বলিব—"আয় ভাই তুই দোষী আমি দোষী, তুই আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোকে ক্ষমা করি, তুই আমা হইতে শিক্ষা কর, আমি তোর কাছে শিক্ষা করি; আমি না পারি তুই আমার, তুই না পারিস আমি তোর স্থল পূর্ণ করি; আয় এইরূপে ভারতের ভগ্ন সমাজ গঠন করি, ভারতের কলঙ্ক অপসারিত করি।" আহা! একথা ভাবিতেও অশ্রুপাত হয়!

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি উদ্দেশ্যে এই উপসংহার গ্রন্থের প্রচার করিতেছ, কি নিমিত্ত এরূপ চেষ্টিতের অনুসরণ করিতেছ?—তাঁহাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে—পতিত ভারতে জাতীয় জীবন সংগঠন কামনায়। জাতীয় জীবন সংগঠনে দুইটী বিষয় চাই,—ধর্ম্ম ও ব্যবহার দর্শন। ধর্ম্ম ভিন্ন সে জীবনের সৃষ্টি হয় না, ব্যবহার দর্শন ভিন্ন সে জীবন তিষ্ঠিতে পারে না। ঠিক যেমন শরীরের জন্য দুইটী বিষয়ের আবশ্যকতা, প্রথম রক্ত দ্বিতীয় পিত্ত। রক্ত ভিন্ন শরীরের চেতনা অসম্ভব, শারীরিক কার্য্যও বন্ধ হয়; কিন্তু কেবল রক্তাধিক্য ঘটিলেও অপকার ঘটে। পিত্তের সাহায্যে আহার্য্য বস্তু পরিপাক পাইয়া রক্তের সাহায্য

করে ও শরীর জীবিত রাখে। সেইরূপ ধর্ম্ম ভিন্ন জাতীয় জীবন অসম্ভব, অপিচ ব্যবহার দর্শনের অনুশীলনে যাহাতে ধর্ম্মোন্মত্ততা ও ধর্ম্মান্ধতায় সমাজের অপকার না হয়, তাহা করিয়া সমাজকে প্রকৃতিস্থ রাখে। যে সমাজে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহাই প্রকৃত জীবিত সমাজ। এতদুভয়ে বিরোধ ঘটিল কি সমাজের অকল্যাণ জন্মিবার সম্ভাবনা হইল। যদি কেহ বলেন, যৎকালে ব্যবহার দর্শনের উৎপত্তি হয় নাই, তৎকালে কি কেবল ধর্ম্মের উপরে কোন জাতির মহত্ব সংস্থাপিত হয় নাই? আমরা বলিব—না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোন না কোন প্রকার সামাজিকতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দর্শনানুশীলনের আকারে না হউক, সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার দর্শনের স্থূল স্থূল বিষয় গুলির আলোচনা করিয়াছে। তবে অনেক সময়ে অনেক জাতি সেই সামাজিকতাকে উপেক্ষা করিয়াও ধর্ম্মোন্মত্ততায় জগতে বল বিক্রমের অনেক পরিচয় দিয়াছে। আমরা তাহাকে জাতীয় জীবন বলি না, তাহাকে বলি জাতীয় জীবনের বিকার। রক্তাধিক্যে যেমন হিষ্টিরিয়া হইয়া মনুষ্য একাকী পাঁচ-ব্যক্তির সমান বল প্রকাশ করে, তাহারাও তাহাই করিয়াছে। কিন্তু সেই বল অনেক কাল রয় নাই এবং

তাহার ফলও অশুভই দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদিগের দিগ্বিজয় ইহার সুন্দর প্রমাণ। প্রজ্বলিত হুতাশন সম বিষম ধর্ম্মোন্মত্ততায় মহম্মদের শিষ্যেরা একহস্তে কোরাণ ও হস্তান্তরে তরবার লইয়া বহির্গত হইয়াছে, পঙ্গপালের মত দেশের পর দেশ ও জাতির পর জাতিকে পদানত করিয়াছে কিন্তু এই জাতীয় জীবনের বিকার হেতু দেশ জয় করিয়াও তাহার শাসন সংরক্ষণের ও নবজীত দেশে প্রকৃত সমাজবন্ধনের যত্ন করিতে অবসর পায় নাই। তাই যাই ধর্ম্মোন্মত্ততারও হ্রাস হইয়াছে, অচিরকাল মধ্যে সে সকল রাজ্য ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেখানে মুসলমান জাতি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানেও প্রকৃত জীবনের লক্ষণ নাই; উন্নতির আশা নাই তাহাদিগের সেই জাতীয় জীবনের বিকার আর নাই, অথচ ব্যবহার দর্শনের আলোচনার অভাবে প্রকৃত জাতীয় জীবন সংগঠিত হয় নাই।

যদি কেহ আশা করেন, একমাত্র ব্যবহার-দর্শনের অনুশীলনেই জাতীয় জীবন সংগঠন করিবেন; তবে তাঁহাকেও বিষম ভ্রান্ত মনে করিতে হইবে। মত্ততাই জীবনের লক্ষণ যখন কোন জাতি কোন বিষয়ের জন্য মত্ত হইয়াছে, তখনই সেই জাতির বলবীর্য্যের পরি

চয় পাওয়া গিয়াছে। যখনই সেই মত্ততার হ্রাস হইয়াছে, আর সে জাতির সেরূপ কার্য্যদক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এইরূপ মত্ততার অভাবে ভারতবর্ষীয়েরা ঐইক্ষ্ণং চেষ্টন শূন্য। পরন্তু সেই মত্ততা ধর্ম্মানুমোদিত না হইলে তাহাতে জাতি সাধারণের যোগ থাকে না, এবং তাহা বহুকাল স্থায়ীও হয় না ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত ফরাশি বিদ্রোহ। যে পরিবর্ত্তন স্পৃহায় ফরাশি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহার মূল ধর্ম্ম নহে—স্বার্থ; সুতরাং তাহাতে দেশশুদ্ধ সকল লোক এক বাক্য হয় নাই, এবং সেই স্পৃহা ও সেই কণ্ডুয়ন ও অনেক কাল স্থায়ী ছিলনা

পূরাকালে রোমক জাতি স্বদেশানুরাগের মত্ততায় কত বল বীর্য্যই না প্রদর্শন করিয়াছিল। রোমীয় বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বিক্ত হস্তে শত্রুর তরবারিতে তনুত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে হাসিতে হাসিতে দগ্ধ হইয়াছেন সেই মত্ততার মূলে ধর্ম্ম না থাকিলে কদাপি এরূপ হইতে পারিত না। অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী রোমক রাজত্বে যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা মার্সদেবের মন্দিরের দ্বার তিন বার মাত্র অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে রোমক বিক্র-

মের মূল ধর্ম্ম কিন্তু যদি রোমকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট-তর সামাজিকতা না থাকিত, যে কোন প্রকারে হউক সমাজতত্ত্বের আলোচনা ন থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দীর্ঘকাল তাহারা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিত না!

ইদানীং এদেশে "রাজনীতির চর্চ্চা" নামে একটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কথাতে বক্তৃতাতে প্রবন্ধে পুস্তকে ও সংবাদপত্রে এই আন্দোলন চলিতেছে শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন প্রকারে গ্রাম্যতা পরিবর্জ্জিত লোক মাত্রেই এমন কি বিদ্যালয়ের বালকও এই বিষয়ে দুইটী কথা কহিতে ভাল বাসে, কথা প্রসঙ্গে নীরব থাকিতে পারে না। যাহারা এই আন্দোলনে আন্দোলিত, তাহাদিগের অধিকাংশই যে চিন্তাশীলতা-শূন্য পরবাক্যবাদী বায়ুবিক্ষিপ্ত তুষের মত চঞ্চল, তাহাতে সংশয় নাই। এরূপ হইলেও এই বর্ত্তমান আন্দোলনকে শুভ লক্ষণই বলিতে হইবে যাহারা অল্প বুদ্ধি কোলাহল কারী অথচ কার্য্যকালে বিপথগামী, তাহারা এ আন্দোলনের মূল নহে। মূল হইতে ধ্বনি উত্থিত হইলেই তাহারা প্রতিধ্বনি করে মাত্র। জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই এইরূপ হইয়া থাকে। এতদ্দারা

এই বুঝা যাইতেছে, যে আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে একজন হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে এমন কয়টী লোক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা এ বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম; ও যাঁহাদিগের হৃদয় সত্য সত্যই স্বদেশের দুঃখে কাতর। তাঁহারাই এই বহু ব্যাধিগ্রস্ত ভগ্ন সমাজের আশা। অতএব যে দিন হইতে ভারতবাসীর অন্তরে এই আন্দোলন উত্থিত হইতেছে, সেই দিন হইতে আমরা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবার সময় গণনা করিতে পারি।

কিন্তু ভারতের পক্ষে এ আন্দোলন যথেষ্ট নহে। জন্মভূমির নিকট এ আন্দোলন আন্দোলনই নহে। বিস্তীর্ণ সরোবরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ পতন হইলে যেমন হয়, ভারতের বিস্তীর্ণ বক্ষে এই অনুচ্চ ধ্বনি তেমনই কেহ শুনিতে পায় না। যখন জনাকীর্ণ নগরে দ্বিতল গৃহে শিক্ষিত কতিপয়ের সঙ্গম হয়, তখনই ঐ আন্দোলন অনুভব করি। যখনই চিন্তাশীল বন্ধুর সঙ্গে শকটারোহণ করি, তখনই কেবল এই প্রসঙ্গ কর্ণে প্রবেশ করে। কিন্তু যখন নগরোপান্তে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করি, সে কথা স্বপ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। লোক অদৃষ্ট লইয়া ব্যস্ত, আহার বিহারে উন্মত্ত, অর্থ স্পৃহায় লালায়িত, কেহ সে কথা বলে না,

কেহ তাহা শুনাবে না, কাহারও নিকট তাহা বলিতে পারি না যদি বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে বিংশতি শত লোকও এই আন্দোলন না করে, তবে দেখ লক্ষে একজনও তোমার আমার এ আন্দোলনের ধার ধারে না। স্রোতজলে অল্পমাত্র বাত সংযোগেই তরঙ্গ উত্থিত হয় সে তরঙ্গ সর্ব্বত্র প্লাবিত হয়। যুগযুগান্তরের অজ্ঞানতায়, বহুকালের সাম্প্রদায়িকতায়, শত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারত নিদ্রিত চেতনা শূন্য স্পন্দরহিত হইয়া পড়িয়াছে. মুষ্টিযোগে তাহার চেতনা জন্মিবেনা, অল্পায়াসে ভারতের ভগ্নসমাজ গঠিত হইবে না; ভারতের অঙ্কুরিত জাতীয় জীবন স্ফূর্ত্তি পাইবে না। যাঁহারা ভারতের জন্যে কাতর, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদিগের উচিত যাহাতে ভারতের ঘরে ঘরে এই অভিনব আন্দোলনের তরঙ্গের প্রতিঘাত হয় তাহার চেষ্টা করেন। এ সামান্য গ্রন্থ সে চেষ্টার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে, এই উদ্দেশ্য

আর একটী কথা অতি গুরুতর। যখন এ আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, তখন আজি হউক কালি হউক আর শত বর্ষ পরে হউক ( ) ইহা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যাহার প্রারম্ভে গোলযোগ থাকে. সূত্রপাত মাত্রে-

যাহা যথার্থ পথ পরিত্যাগ করে, তাহার পরিণাম মন্দ হয; তাহাতে একরূপ অবনতি হইতে অন্যরূপ অথবা অধিকতর অবনতিতে পাতিত করে। আজি কালিই এই আন্দোলনকারীদিগের অনেকের বিষম ভ্রম পরিলক্ষিত হইতেছে, পরে যে আরো ও অধিক হইবেনা কে বলিতে পারে? এইক্ষণ অনেকেই স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা, অকৃতজ্ঞতাকে পুরুষার্থ, এবং স্বার্থের রূপান্তরকে সৎ শাস্ত্র মনে করিতেছে। মনুষ্য কদাপি ভ্রান্তি পরিশূন্য হইবে না; কিন্তু যাহাতে সত্যের অপলাপ নাহয়, তত্বজ্ঞ এবং পরিণামদর্শীদিগের তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে করণীয। সত্যের সমধিক চর্চ্চাই অসত্যের বিনাশের হেতু। যাহাতে এদেশে কথিত "রাজ নীতির" সমালোচনায় সুফল ফলে, তচ্চেষ্টা সর্ব্বথা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই চেষ্টার কথঞ্চিত সাহায্য ও এই সামান্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহারদর্শনানুশীলনোপযোগী কোন গ্রন্থ নাই। অন্যান্য ভাষায় থাকিলেও এযাবৎ তাহার কিছুই অধ্যয়ন করা হয় নাই। এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এরূপ সুলভ উপায় কেন যে পরিত্যাগ করিলাম, অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয়

হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর স্থলে আমার বক্তব্য এই, কোন কার্য্য করিতে যাইয়া পারত পক্ষে পরের উপর নির্ভর করা আমার প্রকৃতি নহে। অবশ্যই স্বীকার করিব, প্রাগুক্ত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করিলে কার্য্য ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তদবস্থায় আমাকে একটী বিপদে পড়িতে হইত বলিতে কি আমাকে তাহাদিগের গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়াই কৃতার্থ হইতে হইতে। আত্মচেষ্টায় সত্যানুসন্ধান করিতে গেলে ভ্রম প্রমাদের অনেক সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা না করিলে মনের সত্যানুসন্ধান স্পৃহা ও বিচার শক্তির প্রখরতা জন্মেনা; এই গুরুতর লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অপর, জ্ঞানীর যাহা সত্য বলিয়া বহু চিন্তায় ও বহু বিতণ্ডায় মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অসত্য হইলেও খণ্ডন করা সহজ নহে। যদি কেহ বলেন, দার্শনিকদিগের মীমাংসা গুলি অগ্রে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া স্বাধীন ভাবে সত্য নির্ণয় করিয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই সুসঙ্গতছিল; তাহাকে বলিব—হৃদয়ের ব্যাকুলতা এ অবসরের প্রতীক্ষা করিতে দিলনা। পরন্তু আরো ও কারণ আছে—পাঠক ক্ষমা করিবেন, তাহা বলিতেও পারিতেছি না।

ব্যবহারদর্শন অতি দুরূহ দর্শন। সাহিত্যদর্শন বল, পদার্থদর্শন বল, কিছুই এমন উৎকট নহে। বাহ্য জগত-পরিবর্ত্তনশীল বটে, সাহিত্যাদিও উন্নতিশীল, কিন্তু অন্য কোন দর্শনের আলোচ্য বিষয় এমন পরিবর্ত্তনসহ নহে। ব্যবহার দর্শনের আলোচ্য বিষয় লোক-চরিত্র। সাহিত্য, গণিত,জ্যোতিষ ও মনোবিজ্ঞানে প্রবেশ করা তত কঠিন নহে। ব্যবহার দর্শনের ভিত্তি অধিকতর অস্থির এবং উহার অভ্যন্তেরও বৈচিত্র অত্যধিক। ব্যবহার দর্শনের অনুশীলন বহু চিন্তা, বহু পরিশ্রম ও একান্ত সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই বহ্বায়াসসাধ্য কার্য্যের পূর্ব্বাভাস মাত্র। গোষ্পদে যেমন অনন্ত আকাশের প্রকার মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। ইহা-তেও কেবল সেইরূপ ব্যবহার দর্শনের অতি স্থূল—অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাধারণের বিচারার্থ এই প্রথম খণ্ড প্রচার করিলাম। ইহাতে একটী অনতিদীর্ঘ উপক্রমণিকা ও প্রথম পাঠোপযোগী কতকগুলি অতি স্থূল মাত্র সংজ্ঞা করা গেল। উত্তর খণ্ড সমূহে অধিক সংখ্যক সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা সকলের বিশেষ সমালোচনাদি প্রকটিত হইবে। সেই সময়ে এতদ্বিষয়ক প্রচলিত গ্রন্থাদি ও পর্য্যালোচনা

করা হইবে। এই প্রথমোদ্যম জাত চিন্তার মালা অবিমিশ্ররূপেই স্বদেশীয়দিগের করে অর্পণ করিলাম।

পরিশেষে তরুণবয়স্ক পাঠকদিগের নিকট বক্তব্য এই, তাহারাও এই গ্রন্থ পাঠকালে স্বাধীন চিন্তার উপরে নির্ভর করিবেন। শ্রুত কথায় অনুচিত আস্থা প্রদর্শন করিয়া আত্ম্য বুদ্ধির অবমাননা করিবেন না। সত্যানুশীলনের প্রণালী এই,– অগ্রে সত্যানুসন্ধান-স্পৃহা অন্তরে বলবতী করিতে হয়, তৎপরে স্বাধীন চেষ্টায় সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতে হয়। অবশেষে অন্যের মীমাংসার সঙ্গে আপনার মীমাংসার তুলনা করিতে হয়। এইরূপ সংঘর্ষণের পর অবশিষ্ট যাহা থাকে যাহা লাভ করা যায়, তাহার নাম বিজ্ঞতা; রাশি রাশি পল্লবগ্রাহীতা অপেক্ষা এক মুষ্টি বিজ্ঞতাই প্রার্থনীয়।

ব্যবহার দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংজ্ঞা প্রকরণ

১। যাহার অনুশীলন করিলে রাজা কি, প্রজা কি, উহাদিগের পরস্পার সম্বন্ধ কি, এতদুভয়ের কর্ত্তব্য কি, এবং কি উপায়েই বা সেই কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে, এ সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ব্যবহারদর্শন বলে।

দর্শন মাত্রেরই রীতি এই, যত গুলি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহার সংজ্ঞা করিয়া লওয়া হয়; পশ্চাতে যাহার সংজ্ঞা কি ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পূর্ব্ব সংজ্ঞায় তাহার উল্লেখ করা যায়না। ইহাই যুক্তিসঙ্গত এরূপ না করিলে দুরূহ বিষয় বুঝিয়া উঠা যায়না এই সংজ্ঞাটী যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইতে পারিত তবে কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে স্বভাবতঃই তাহার উদ্দেশ্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে; এজন্যই এ সংজ্ঞাটী প্রথম স্থলে স্থাপিত হইল এবং এই জন্যই উহাকে এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত করিয়া লেখা হইল।

বাস্তবিক যদ্দ্বারা রাজ্যশাসন বিষয়ে জ্ঞানজন্মে, তাহাকেই ব্যবহার দর্শন বলে।

২৭। 'পরস্পর সম সুখদুঃখভাগী' লোক সমষ্টিকে সমাজ বলা যায়।

সম-সুখদুঃখভাগীতায় এই কয়টী আবশ্যক, ১ম ব্যক্তিত্ব-বোধ অর্থাৎ সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বত্ব ও সুখ স্বচ্ছন্দ অব্যাহত রাখিতেই হইবে এই বোধ; ২য় সমষ্টিত্ব বোধ অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকের একত্রাবস্থানই সমাজ, ঐ সকল লোকের সমবেত সামর্থ্যই সমাজের শক্তি, এবং সেই শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন সমাজের উন্নতি বা শাসন অসম্ভব, এই বোধ; ৩য় সহানুভূতি বোধ অর্থাৎ সমাজে যত গুলি লোক বসতি করে উহাদিগের একের সুখ দুঃখ কি উন্নতি অবনতিতে অপরকেও সুখী দুঃখী উন্নত বা অবনত হইতে হইবে, উহাদিগের সাধারণের যে অবস্থা ঘটে, অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেকেরই সেই অবস্থা ঘটিবে এই বোধ। (উপক্রমণিকা দেখ)

ইংরেজদিগকে একটী সমাজ বলা যাইতে পারে ইংরেজ সমাজ-বন্ধনের উদ্দেশ্যই প্রত্যেক ইংরেজের স্বত্ব ও সুখ স্বচ্ছন্দ অব্যাহত রাখা, এবং তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক ইংরেজকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথা যোগ্য অধিকার প্রদান করা, সমস্ত ইংরেজের ক্ষমতা একীভূত করতঃ প্রবল শক্তি সংগঠন করিয়া তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের উন্নতি করা। ইংরেজেরা ইহাও বুঝিতে পারে, যে প্রত্যেক ইংরেজের সুখ দুঃখ অন্যের সুখ দুঃখের সঙ্গে অনুস্যূত।

সম-সুখদুঃখভাগীতার এই সকল কারণ বিশিষ্ট যথা—

(ক) প্রকৃতি বা গঠনসাম্য দুইটী সমান বস্তুতেই একরূপ ঘনিষ্টতা জন্মে। স্বভাবের সমতাহেতু মনুষ্য মাত্রই অপরের সঙ্গে একরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সকল মনুষ্যই নিঃসম্পর্কিত পর সুখ দুঃখে (যেখানে

নিজের কোন প্রকারের ও স্বার্থ বা অনিষ্ট সুখ্যাতি বা অপমাননার কারণ নাই) উৎফুল্ল বা বিমর্ষ হয়।

(খ) একত্রাবস্থান মনুষ্যেরা একত্র হইয়াই বসতি করে। দেশ কাল প্রভাবে উহারা এরূপ ঘনিষ্ঠ রূপে সম্বদ্ধ হইয়া পড়ে, যে পরস্পর পরস্পরের উন্নতিতে উন্নত, অবনতিতে অবনত, এবং সুখ ও দুঃখে সুখী ও দুঃখী না হইয়া পারেনা।

(গ) ধর্ম্ম বা মতের একতা যে সকল লোক এক ধর্ম্ম বা এক মতাবলম্বী, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি একরূপ, উঁহাদিগের মধ্যে আদান প্রদানাদি হইযাও নানা প্রকার পারিবারিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় উহারাও পরস্পর সম-সুখ দুঃখী না হইয়া পারেনা।

(ঘ) অবস্থা বা স্বার্থের একতা। যাহারা একরূপ অবস্থাপন্ন বা যাহাদিগের স্বার্থ এক, তাহারাও পরস্পর সম-সুখদুঃখভাগী না হইযা পারে না।

(ঙ) এক ভাষীত্ব যাহারা একভাষী তাহাদিগের মধ্যে হৃদয় মনের বিনিময় হয়, পরস্পরের চিন্তা ও বাসনার সমধিক পরিচয় সম-সুখদুঃখভাগীতার হেতু। ভাষাদ্বারা মনুষ্য চরিত্র গঠিত হয়, চরিত্রে সাদৃশ্য সম সুখ দুঃখ ভাগীতার কারণ

(চ) রুচির একতা ও সম সুখদুঃখভাগীতার কারণ

৩। যে সকল অনুশাসনবাক্য দ্বারা কোন সমাজ শাসিত হয়, তাহাদিগকে বিধি, এবং ঐ সকল বিধির সমষ্টিকে শাস্ত্র বলে।

কতিপয় শব্দ সমন্বয়ে কোন অর্থ প্রতিপাদিত হইলে তাহাকেই বাক্য বলে, সেই বাক্য কোন বিশেষ ভাবপ্রকাশক হইলেই তাহাকে ভাবাত্মক বাক্য বলে; আর যে সকল বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সমাজ

পরিচালিত হয়,' সামাজিকেরা সকলেই যাহা পালন করিতে বাধ্য, তাহাদিগকেই অনুশাসনবাক্য বলে "পরদ্রব্য অপহরণ করিও না" এটী একটী অনুশাসন বাক্য।

শাস্ত্রকে সংহিতা এবং বিধিকে বিধানও ব্যবস্থাও বলা গিয়া থাকে

৪ প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বভাবতঃ প্রাপ্ত স্বোপার্জ্জিত এমন কতকগুলি অধিকার থাকে, যাহা থাকাতে অন্যের তাদৃশ অধিকারের ব্যাঘাত হয় না, এবং যাহা সে স্বয়ং ধ্বংশ না করিলে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত বা চ্যুত করা যায় না, তাহাকে স্বত্ব বলে।

স্বত্বের মূলই হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ অধিকার কাহাকেও দিলে তদ্দ্বারা অন্য কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হয় না, তাহাকে স্বত্ব বলে

কাহাকেও স্বীয় বেতন পাইবার অধিকার না দিলে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ করা হয়, অথচ সে ব্যক্তি তাহার বেতন পাইলে তাহাতে অন্য কাহারও ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতার কোন অপচয় হয় না, অতএব ঐ বেতন পাইতে তাহার স্বত্ব আছে এক ব্যক্তি আমাকে কিছু দান করিল, ঐরূপ দান করাতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন ক্ষতি করা হইল না; সুতরাং ঐ দত্ত বস্তুতে আমার স্বত্ব ঐরূপ দান করিতে দাতার অধিকার আছে, এই বস্তু যদি আমাকে পাইতে না দেওয়া হয়, দাতারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ করা হয়।

মনুষ্য জন্মিবা মাত্রই এই অধিকার পায়, যে সে যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে। এটী স্বাভাবিক স্বত্ব,-উত্তরাধিকার বা দান

ক্রমে কোন বস্তুতে যে অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রাপ্ত স্বত্ব বলে আর আত্ম চেষ্টায় কোন বিষয়ে প্রাপ্ত অধিকারকে স্বোপার্জিত স্বত্ব বলে

রামের পিতাকে ভয় করিয়া প্রতিবেশীরা বার্ষিক কতক টাকা দিত। পিতৃবিয়োগের পর রাম পৈত্রিক সমুদয় সম্পত্তিতে অধিকারী হইল। প্রতিবেশীরা ঐ অর্থ এইক্ষণ স্বেচ্ছায় দান করিলেও তদ্গ্রহণে রামের অধিকার নাই, তাহাতে রামের স্বত্ব নাই।

কারাবাসীদের যথেচ্ছা গমনাগমনের স্বত্ব নাই, কেন না তাহারা সেই স্বত্ব স্বয়ং ধ্বংশ করিয়াছে।

৫। কতকগুলি সাধারণ বিধির অন্তর্গত ও কতক গুলি সাধারণ স্বত্বে স্বত্ববান সমাজকে প্রজাসাধারণ এবং উহার এক২ ব্যক্তিকে প্রজা বলে।

সাধারণ বিধি অর্থাৎ যে বিধি সমাজের সকল ব্যক্তির উপর বর্ত্তে। বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোক সমূহে যে সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে "পরস্পর ধর্ম্ম বিষয়ে উদার হইতে হইবে' এরূপ কোন বিধিকে সাধারণ বিধি বলে।

সাধারণ স্বত্ব অর্থাৎ সমাজের সকল ব্যক্তিরই যে স্বত্ব থাকে। "সমাজের লোক মাত্রই যে ব্যবসায় ইচ্ছা করিতে পারিবে' এরূপ কোন স্বত্বই সাধারণ স্বত্ব।

দৈবযোগে দিগ্‌দেশান্তর হইতে কতকগুলি দস্যু আসিয়া কোন অরণ্যে বসতি করিতে লাগিল, উহারা প্রজা নহে; কেন না উহাদিগের মধ্যে কোন সাধারণ বিধি বা স্বত্ব নাই

৬। সমুদয় প্রজার ক্ষমতার সম্মিলনকে প্রজাশক্তি বলে

যে পরিমাণে হউক, প্রত্যেক প্রজারই জ্ঞান ধন ও বাহুবল আছে; যখন সাধারণের মঙ্গল কামনায় প্রজাবর্গের সেই জ্ঞান ধনাদি একীভূত হইয়া প্রবল শক্তি রূপে পরিণত হয়, তাহাকে প্রজাশক্তি বলে

প্রজাগণ অত্যাচারী রাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে, ইহা প্রজাশক্তির কার্য্য। প্রজাগণ বিদ্যা বুদ্ধি ও কল কৌশলজ্ঞ হইয়াছে, সেটী প্রজাশক্তির বৃদ্ধির কারণ। প্রজাগণের প্রদত্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহাও প্রজাশক্তির এক অঙ্গ।

৭। সমুদয় প্রজাশক্তি যেখানে সম্বদ্ধ হয়, যাহাকে আশ্রয় করে, যদ্দ্বারা নিয়মিত হয়, ও যাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাকে রাজা বলে

প্রজা সাধারণের সমুদয় শক্তির প্রতিনিধি এক অথবা কতিপয় ব্যক্তিই রাজা।

সমুদয় প্রজাশক্তি যেন একটী বৃত্ত। প্রত্যেক প্রজার শক্তি এক একটী ব্যাসার্দ্ধ, আর রাজা ঐ বৃত্তের কেন্দ্র। সমুদয় ব্যাসার্দ্ধ, যেমন কেন্দ্র বিন্দুতে সম্মিলিত হয়। কেন্দ্র বিন্দুকেই আশ্রয় করে অর্থাৎ কেন্দ্র দ্বারাই ব্যাসার্দ্ধ সকলের ঘন সন্নিবেশ, সমদূরতা ও সমদৈর্ঘ্য নিয়মিত হয়। কেন্দ্র ছাড়িয়া সমুদয় ব্যাসার্দ্ধ বৃত্তের অন্যত্র গমন করিতে পারে না, করিলে আপনার বিপর্য্যস্ত হয় ও বৃত্তই থাকেনা। সেইরূপ রাজারূপ প্রতিনিধিতে সমবেত হইয়াই প্রজাশক্তি বলশালী ও কার্য্যকারী হয় রাজাকে আশ্রয় না করিলে প্রজাশক্তি জীবিত থাকিতে পারে না, রাজা দ্বারা সুনিয়মিত না হইলে প্রজাশক্তি আত্ম কলহে উৎসন্ন হইতে পারে প্রজাশক্তি রাজাকে (অতিক্রম) অমান্য করিলে স্বেচ্ছাচারী ও বিশৃঙ্খল হইয়া বিনষ্ট হয়।

৮। রাজার যে শক্তি দ্বারা প্রজাশক্তি নিয়মিত হয়, তাহাকে রাজশক্তি বলে

প্রজাশক্তিই রাজশক্তির স্রষ্টা, প্রজা সাধারণের হিতার্থে প্রজাশক্তি রাজাকে কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ ও তদনুগমন করে।

ইংলণ্ডবাসীরা রাজাকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, যে তাহারা (প্রজাশক্তির প্রতিনিধি পার্লেমেণ্ট সভাদ্বারা) ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবে, রাজা তাহাতে সম্মতি দিলেই তাহা পালনীয় হইবে এইরূপ রাজা যতকাল সম্মতি না দেন, ততকাল তাহারা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। এই সম্মতি প্রদানের ক্ষমতাই রাজশক্তি।

৯। রাজশক্তি দ্বারা প্রজাশক্তি সুনিয়মিত হইতে পারিবে, এইজন্য রাজার কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে, তাঁহাকেই রাজকীয় বিশেষ অধিকার বলে।

বাস্তবিক যিনি রাজা, (প্রজাশক্তির প্রতিনিধি) তিনিও একজন প্রজা এই রাজা প্রজাত্ব এক ব্যক্তিতে অর্পিয়াছে বলিয়া যাহাতে এতদুভয়ের সামঞ্জস্য হইতে পারে, এইজন্য সেই ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে, তাহাতেই তিনি সাধারণ প্রজার ন্যায় ব্যবহৃত হন না। রাজার সুখস্বচ্ছন্দ নহে, কেবল রাজ্যের সুশাসন কল্পেই এই ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সম্পত্তি যিনি যে সময়ে রাজা হইবেন তিনিই পাইবেন কি ভোগ করিবেন; অপরাধী হইলেও রাজা কোন ধর্ম্মাধিকরণে বিচারার্থ আনীত হইবেন না; রাজা কোন সাধারণ কারাগারে আবদ্ধ হইবেন না; রাজা বিশেষ বিশেষ কোন অপরাধীকে ইচ্ছা করিলেই মুক্ত করিতে পারিবেন; ইত্যাদি রূপ অধিকারকেই রাজকীয় বিশেষ অধিকার বলে

১০। যে সমাজে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাকে রাজ্য বলে।

সমুদয় প্রজাশক্তি সম্মিলিত হইযাই বাজশক্তিব সৃষ্টি কবে, এবং সেই রাজশক্তিব বশীভূত হইতে আপনা হইতেই বাধ্য হয়। বাজশক্তিও আবার প্রজাশক্তিব এমন আয়ত্ত থাকে, যে কোন ক্রমেই প্রজাশক্তি কে উপেক্ষা কবিয়া কোন কার্য্য করিতে পারেনা। যে সমাজে এই রূপে কার্য্য চলে তাহাই প্রকৃত বাজ্য বার্ত্তা শাস্ত্রে আব কাহাকেও বিশুদ্ধ বাজ্য বলিযা স্বীকাব কবা যায় না পূবা কাল হইতেই জন সমাজে কতকগুলি শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ সকল সাশন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত সমাজ সকলকেও বাজ্যই বলা হইযা থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সকল গুলি প্রকৃত রাজ্য নহে।

(ক) যেখানে এক মাত্র বাজাব ইচ্ছানুসাবই প্রজাশক্তি পবিচালিতা হয়, তাহাকে যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী কহে

(খ) যেখানে বাজা প্রজাব মত লইয়া কার্য্য কবেন, তাহাকে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী কহে।

(গ) যেখানে বাজা এবং প্রজা উভয়েই কতক গুলি প্রতিষ্ঠিত নিযমেব বাধ্য হইয়া কার্য্যকবে, তাহাকে নিযমতন্ত্র শাসন-প্রণালী বলে

(ঘ) যেখানে প্রজা সাধাবণের ইচ্ছানুসারেই বাজ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে সাধাবণতন্ত্র শাসন-প্রণালী বলে

(ঙ) যাহা প্রকৃত রাজ্যনহে, অথচ এইরূপ কোন শাসন প্রণালীব অন্তর্গত নহে, তাহাকে বিমিশ্র শাসন-প্রণালী কহে

১১ কোন রাজ্য যেস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে রাজ্যাধিকার বলে।

রাজ্য ও রাজ্যাধিকার দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ রাজ্য, রাজা প্রজা প্রভৃতি জন সমূহ আর রাজ্যাধিকার, দেশ মহাদেশ প্রদেশাদি স্থান বিশেষ

কতকগুলি লোক যাবজ্জীবন নৌকারোহণে অবস্থিতি করে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসতি না করিয়াও যদি তাহারা রাজ্য শাস্ত্রানুযায়ী শাসন প্রণালীর অনুগমন করে, তাহা হইলে তাহারা একটী রাজ্য হইতে পারে।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যুদ্ধ হইয়া যদি ফরাশির জয় লাভ করে, আর ইংরেজেরা সকলে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ফরাশিদের ইংলণ্ড দেশ অধিকার করা হইল, ইংরেজ-রাজ্য অধিকার করা হইল না।

১২। কোন বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বংশ, বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ শ্রেণী, বা বিশেষ জাতি যত কাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকে; তত কালকে তদীয় রাজত্ব বা তদীয় রাজ্যকাল বলে।

১৩। যখন কোন রাজ্যে রাজশক্তি প্রজাশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তাহাকে রাজশক্তির অতি-ব্যবহার বলে।

১৪। যখন কোন রাজ্যে প্রজাশক্তি রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন তাহাকে প্রজাশক্তির অতি-ব্যবহার অথবা বিদ্রোহ বলে।

যখন রাজশক্তি বা প্রজাশক্তি অপরের ধ্বংসের চেষ্টা করে, তখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তেমনই আবার একতর শক্তি যে সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয, যদি তাহার অন্যথাচরণ করে, তখনও পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ হইবে।

পরস্পরের ধ্বংশের চেষ্টাও প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অন্যথাচরণ করার তাৎপর্য্য একই, উহার পরিণাম একই ; তবে একস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একে অন্যের বিলোপ কামনা করা হয় মাত্র। রাজা প্রজাশক্তির অস্তিত্বের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও এমন কার্য্য করিতে পারেন, যাহাতে প্রজাশক্তির ধ্বংশের সূত্রপাত হইতে পারে ; প্রজার পক্ষেও আবার সেইরূপ।

যদি কোন রাজ্যে এরূপ নিয়ম থাকে, যে রাজার অভাবে অমুক ব্যক্তি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তদবস্থায় রাজা কিম্বা প্রজাবর্গ সেই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে।

১৫। রাজশক্তিও প্রজাশক্তিতে পরস্পর বিরোধকে রাষ্ট্র বিপ্লব কহে।

১৬। রাজশক্তিও প্রজাশক্তিতে বিরোধ হইয়া যখন রাজশক্তির অপলাপ হয়, সেই অপলাপকে রাজ-বিপর্য্যয় কহে।

১৭। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তিতে বিরোধ হইয়া যখন প্রজাশক্তির অপলাপ হয়, সেই অপলাপকে প্রাকৃ-তিক বিপর্য্যয় কহে।

১৮। রাজশক্তির অপলাপ হইয়া যতকাল উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত কালকে অরাজক কহে।

১৯। প্রজাশক্তির অপলাপ হইয়া যতকাল উহা

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততকালকে অপ্রাকৃত অবস্থা বলে।

২০। কতকগুলি রাজ্য স্বাধীন ভাবে শাসিত হইয়া যখন কোন এক সাধারণ রাজশক্তির অধীন হয়, তখন তাহাদিগের সমষ্টিকে সাম্রাজ্য বলে

২১। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক এক খণ্ড রাজ্যকে উপরাজ্য বলে।

দেশের অবস্থা ও আচার ব্যবহারাদি ভেদে প্রত্যেক রাজ্যেই শাসন-প্রণালী ও বিধি ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সেইরূপ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে শাসিত হইয়াও যখন কতকগুলি রাজ্য স্ব স্ব হিতার্থে সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ সকলেরই রাজস্বের কিয়দংশ একত্রিত হইয়া কোন সাধারণ কর্ম্ম করা, কতকগুলি সাধারণ সৈন্যবলদ্বারা সকলের স্বার্থ রক্ষা করা ইত্যাদিরূপ কার্য্য করা হয়, তখন তাহাদের সকলকে এক সাম্রাজ্যান্তর্গত বলা যায়।

২২। কোন রাজ্যের কতকগুলি প্রজা যখন দেশান্তরে গিয়া স্থায়ীরূপে বসতি করে, কিন্তু মাতৃ রাজ্যের শাসন-প্রণালীর অনুগমন করে, তখন তাহাদিগকে উপনিবেশ বলে।

কোন রাজ্যের কতকগুলি প্রজা ব্যবসায় বাণিজ্যাদি উপলক্ষে অত্যল্পকাল, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কোথাও বসতি করিলে উপনিবেশ হইবে না। স্থায়ীরূপে বসতি করার অর্থ কোন স্থানে বিত্ত সম্পত্তি করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বাস করিয়া সেই স্থানের অধিবাসী হওয়া।

২৩। যে রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসিত হয়, কিন্তু অন্য কোন রাজ্যকে কর (অর্থ অথবা অন্য কোন প্রকার সাহায্য) প্রদানে বাধ্য, অর্থাৎ যে কর না দিলে তাহার করদ রাজ্যত্ব থাকে না, তাহাকে করদ রাজ্য বলে।

কোন রাজ্য অর্থের পরিবর্ত্তে সৈন্য যোগাইতে বাধ্য হইলে, শস্যাদি কি অপর বিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রদানে বাধ্য হইলে তাহাকেই করদ রাজ্য বলে।

কোন বিশেষ প্রত্যুপকার লাভ করিয়া কোন রাজ্য অন্য রাজ্যকে পূর্ব্বোক্তরূপ সাহায্য প্রদান করিলেই করদ রাজ্য হয় না। করদ রাজ্য কর প্রদানে ক্ষান্ত হইলেই তাহার যে কেবল কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমন নহে, হয় তাহা কর গ্রাহী রাজ্য ভুক্ত হইয়া যাইবে, নচেৎ স্বাধীন রাজ্য হইবে।

ভারতবর্ষে কুচবিহার করদ রাজ্য, কর প্রদান না করিলে কুচবিহার হয় স্বাধীন রাজ্য হইবে, নচেৎ ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হইয়া যাইবে

খাইবার পাস নামক পথের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ইংরেজ রাজ্য কাবুল রাজ্যকে বার্ষিক কতক টাকা দিয়া থাকে, এজন্য ইংরেজ রাজ্য কাবুল রাজ্যের করদ রাজ্য নহে।

করদ রাজ্য ও উপরাজ্যে প্রভেদ এই যে, উপরাজ্য সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ, করদ রাজ্য কোন নিয়মিত কর প্রদানরূপ অধীনতা স্বীকার করে মাত্র। কতকগুলি উপরাজ্য একত্র হইয়া একটী সাম্রাজ্য হয়, কিন্তু কতকগুলি করদ রাজ্য মিলিত হইয়া কোন রাজ্য হইতে পারে না

২৪। যে সকল প্রতিজ্ঞা বাক্য দ্বারা এক রাজ্য

রাজ্যান্তরের সঙ্গে কোনরূপ কার্য্য বা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে সন্ধি বলে।

সন্ধি অর্থ সম্মিলন। দুই রাজ্যে উপকারের বিনিময় মূলক যে সম্মিলন, তাহাকেই সন্ধি বলে।

দুই রাজ্যে বিসংবাদ হইয়া অথবা না হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পরের হিতার্থে উভয়ের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা বাক্য স্থির হয়, তাহাই সন্ধি

২৫ এক রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যান্তরের কলহ হইয়া যখন একে অন্যকে আক্রমণ বা উৎপীড়ন করে, সেই অবস্থাকে বিগ্রহ বলে।

২৬ সন্ধি পত্র দ্বারা যে সকল রাজ্য পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, অথবা যাহারা কেবল পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ না করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকেই মিত্র রাজ্য বলে।

যখন কোন কোন রাজ্য মধ্যে এরূপ সন্ধি হয়, যে আগন্তুক কোন রাজা তাহাদিগের অন্যতরের বিরুদ্ধাচরণ করিলে প্রত্যেকে সেই অন্যতরের সাহায্য করিবে, তখন তাহারা মিত্ররাজ্য হয়

যখন কোন কোন রাজ্যে এরূপ সন্ধি হয় যে, উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না করিলেও বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, তখন তাহারা মিত্র রাজ্য হয়

২৭। যখন কতিপয় রাজ্য এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, কিং

কি জন্য কোন বিশেষ নিয়ম পালন করিবে; যে কেহ ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণ অথবা ঐরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সেই সকলের শত্রু হইবে, তখন সেই প্রতিজ্ঞা বা নিয়মকে রাজশক্তির সাম্য, অথবা শক্তিসাম্য বলে।

সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্য যদি একরূপ কোন বিশেষ নিয়মাধীন না হয়, তাহা হইলে সকলেরই (কোন্ সময়ে কাহার, তাহার নিশ্চয়তা নাই বটে) শক্তির হ্রাস হইতে পারে এরূপ নিয়ম না থাকিলে কোন রাজ্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে বা আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে না।

চারিটী ক্ষমতাশালী রাজ্যের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, এমন অবস্থায় শক্তিসাম্যের জন্য এরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক, যে ঐ চারি রাজ্যের মধ্যে কেহই মধ্যবর্ত্তী রাজ্য আক্রমণ বা অধিকারভুক্ত করিতে পারিবে না কেননা ঐরূপ যিনি করিবেন তাহারই শক্তিবৃদ্ধি হইবা অপরাপরের সুতরাং শক্তি হ্রাস হইবে এইরূপে প্রতিবেশী অপেক্ষা কেহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলে কাল ক্রমে বিপ্লব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে; এইজন্য শক্তিসাম্যের ব্যবস্থার আবশ্যকতা এবং এই জন্যই যে শক্তিসাম্যের বিধি অমান্য করে, সে সকলেরই শত্রু হয়

২৮। যাহার ইচ্ছা নাই, যাহা স্বাধীন ইচ্ছায় চলিতে পারেনা, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও যাহা কোন পদার্থের গুণ নহে, তাহাকে বস্তু বলে।

মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু যতক্ষণ মনুষ্য সেই স্বাধীন ইচ্ছার কিঞ্চিন্মাত্রও চালনা করিতে পারে না, সম্পূর্ণরূপ পরের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণ তাহাকে বস্তু বলা যায় (যখন এইরূপ পরাধীন থাকা সমা-

জেব অনুমোদিত হয়, যেমন ক্রীতদাস বস্তু) গোমেষাদি চিরদিন পরের ইচ্ছায় চালিত হয়, সুতরাং তাহারা বস্তু।

মনুষ্যের চিন্তা অথবা কল্পনা বস্তু নহে, কেননা উহা চক্ষুঃ কর্ণাদির গ্রাহ্য নহে

দৈর্ঘ্য, সৌন্দর্য্য বা উৎকৃষ্টত্ব বস্তু নহে, কেননা উহা বস্তুর গুণমাত্র

২৯। যে বস্তুর বিনিময়ে যতকাল অন্যবস্তু লাভ করিয়া প্রয়োজন সাধন করা যায়, তাহাকে ধন বলে।

প্রয়োজন সাধনই ধনের উদ্দেশ্য আমার যাহা আছে, তাহাতে আমার বর্তমান প্রয়োজন সাধন হইতেছে না এ অবস্থায় আমার যাহা আছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া তোমার কোন বস্তু লইয়া যদি সেই প্রয়োজন সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার যাহা ছিল, তাহা আমার ধন হয়। বিনিময় ধনের প্রধান লক্ষণ

আমার যদি এক খণ্ড মরুভূমি থাকে, তাহাতে বর্তমান সময়ে আমার কোনই উপকার সাধিত হয় না। কিন্তু যদি কোন দস্যুদলের সঙ্গে আমি এইরূপ বন্দোবস্ত করি, যে তাহারা উহাতে দস্যুতা করিয়া আমাকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে ঐ মরুভূমি আমার ধন হয়

জল বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। কিন্তু যতকাল উহার পরিবর্তে অন্য বস্তু পাইবার অবস্থা না হয়, তত কাল উহা ধন নহে নদীর জল ধন নহে; কিন্তু যদি ঐ জল একটী ঘড়াতে উঠাইয়া উহা বিক্রয় করি, তবে ঐ জল ধন হয় কোন নদী বাহিয়া যাইতে হইলে তজ্জন্য যদি কাহাকেও কিছু দিতে হয়, তবে ঐ নদী সেই ব্যক্তির ধন হয় জনাকীর্ণ নগরে প্রশস্ত উদ্যানের বায়ু সেবন করিতে

হইলে যদি তজ্জন্য কিছু দিতে হয়, তবে সেই বাগু উদ্যান স্বামীর ধন হয়

কোন বস্তু কাহারও ধন হইয়াও যখন আর বিনিময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তখন ধন নহে। ক্রীত দাস স্বামীর ধন, কিন্তু যখন রাজনিয়ম দ্বারা দাসব্যবসায় রহিত হয়, তখন সেই দাস আর ধন নহে

কোন ব্যক্তির বিদ্যা বুদ্ধি বা সৌন্দর্য্য ধন নহে, কেন না উহা বস্তু নহে, উহাতে প্রয়োজন সাধন হয় বটে কিন্তু কতকগুলি সুন্দরী স্ত্রী বিনিময়ে ব্যবহৃত হইতে পারিলে কাহারও ধন হইতে পারে।

৩০ ধনের বিনিময়োপযোগীতাকে মূল্য বলে।

বিনিময় করিতে গেলে বস্তুর নানা প্রকার উপযোগীতা হইতে পারে। কোন বস্তু অপেক্ষাকৃত সহজে বিনিময় করা যায়, এটী তাহার বিনিময়োপযোগীতা এক ঘড়া জল অপেক্ষা এক ঘড়া তৈল সহজে বিনিময় করা যায়, সুতরাং জল অপেক্ষা তৈলের বিনিময়োপযোগীতা অর্থাৎ মূল্য বেশী

অবস্থাভেদে বস্তুর বিনিময়োপযোগীতা অর্থাৎ মূল্যের তারতম্য হয় মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের নিকট এক ঘড়া তৈলাপেক্ষা এক ঘড়া জলেরই মূল্য অধিক

সৌন্দর্য্যানুরাগের তৃপ্তিও প্রয়োজন সাধন, অতএব কোন বস্তু সুন্দর বলিয়া তাহার যে মূল্য অধিক প্রয়োজনই তাহার মূল

দুষ্প্রাপ্যতায় বিনিময়োপযোগীতার বৃদ্ধি হয়। যে বস্তুর অল্পপরিমাণে অন্য বস্তু অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়, সেই বস্তু ঐ অন্য বস্তু অপেক্ষা অধিক বিনিময়োপযোগী কম প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য রৌপ্যের মূল্য অধিক প্রয়োজনীয় সুলভ লৌহাপেক্ষা অধিক।

বিনিময়ার্থ যাহা সহজে বা অধিক দিন রক্ষা করা যায় তাহার মূল্য অধিক । তণ্ডুল এবং বস্ত্র যদি সমান প্রাপ্য হইত, তথাপি বস্ত্র সহজে ও অধিক দিন রাখা যায় বলিয়া উহার মূল্য অধিক হইত ।

সর্ব্বদা সকল বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করা যায় বলিয়া টাকার সাধারণতঃ বিনিময়োপযোগীতা অর্থাৎ মূল্য অধিক । কিন্তু দূরদেশে কোন বস্তু ক্রয় করিয়া সেখানে টাকা অপেক্ষা নোট সহজে পাঠান যায় বলিয়া সে সময়ে টাকা অপেক্ষা নোটের মূল্য অধিক । এইজন্যই অনেক সময় টাকা দিয়া নোট আনিতে গেলে কিছু বাট দিতে হয় । এইজন্যই পয়সা অপেক্ষা কখনও টাকার মূল্য অধিক ।

কোন বস্তুরই নিরপেক্ষ ভাবে একটা মূল্য হইতে পারেনা । কতক-গুলি বস্তুর মধ্যে প্রয়োজনীয়তা দুষ্প্রাপ্যতা ও উপকারিতাদি দ্বারা যে বস্তু অধিক বিনিময়োপযোগী হয় তাহারই মূল্য অধিক । যদি এক-সের লবণ দিয়া দুইসের তণ্ডুল পাওয়া যায়, তবে লবণের মূল্য তণ্ডুলের দ্বিগুণ হইল । অতএব দশসের তণ্ডুলের জন্য একটাকা ও দশ সের লবণের জন্য দুই টাকা দিতে হইবে । কিন্তু যদি এরূপ অবস্থায়ও আমি এক সের লবণের জন্য না বুঝিয়া একটাকা দিই, তবে তাহা উহার মূল্য হইলনা ।

৩১ । ধনের মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিনিময় কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য, রাজা যে সকল ধাতুখণ্ড প্রস্তরাদি বা কাগজ কি চর্ম্মখণ্ড প্রচলিত করেন, তাহকে মুদ্রা বলে ।

সমুদয় ধনের বিনিময়ে কোন এক বস্তু না চলিলে ঐ সকল ধনের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন হয় । মনে কর, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি

একসের লবণের মূল্য কত ? আর যদি এমন কোন বস্তু না থাকে যাহা সকল বস্তুর বিনিময়ে চলিতে পারে, তবে তোমাকে বলিতে হইবে, একসের লবণের মূল্য দুইসের তণ্ডুল। দুইসের তণ্ডুলের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে, এক পোয়া সোরা ইত্যাদি। আমার যদি ঐ এক সের লবণ বিক্রয় করিয়া ঘৃত খরিদ করিতে হয়, আমি কত লবণ দিয়া আধপোয়া ঘৃত পাইব বুঝিতে পারিলাম না। অর্থাৎ লবণ ও ঘৃত উভয়ের মূল্যের তারতম্য জানিতে পারিলাম না কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঘৃত এবং লবণ মুদ্রা দ্বারা উভয়ই পাওয়া যায় বলিয়া আমি সহজেই ঐ বিনিময় কার্য্য সমাধা করিয়া প্রয়োজন সাধন করিতে পারি বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ মুদ্রা প্রচলনের এক প্রধান উদ্দেশ্য।

মুদ্রা অভাবে বিনিময় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়না। মুদ্রা অভাবে কোন সূত্রধরের পাদুকা ক্রয় করিতে হইলে চর্ম্মকারকে কাষ্ঠনির্ম্মিত কোন দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে, সেই সময়ে চর্ম্মকারের কাষ্ঠদ্রব্যে প্রয়োজন না থাকিলে সূত্রধরের পাদুকা ক্রয় করা কঠিন হয়

দূরদেশে কোন বস্তু ক্রয় করিতে হইলে মুদ্রাই প্রেরণ করা যায়, অন্য দ্রব্য প্রেরণ করা সহজ নহে। সুশাসনের বিনিময়ে কৃষকেরা যদি রাজাকে শস্যাংশ প্রদান করিত, তবে রাজকোষের ভয়ানক অবস্থা হইত।

যাহা রাজা প্রস্তুত বা প্রচলিত করেন না, তাহা মুদ্রা নহে যদি কেহ কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করে, তবে উহা ধরা পড়িলে আর মুদ্রা থাকেনা কোন কৃত্রিম মুদ্রা পাইয়াও যদি রাজা উহা প্রচলিত করেন, তবে উহা মুদ্রা হয়। এদেশে পূর্ব্বে কড়ির অত্যন্ত প্রচলন ছিল, রাজা উহা প্রস্তুত করিতেন না বটে, কিন্তু প্রচলিত করিয়াছিলেন ; তাই উহা মুদ্রারূপে গৃহীত হইত

৩২। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত ও স্বোপার্জ্জিত স্বত্ব আছে, তাহা রাজনিয়মের আনুকূল্যে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারকে প্রজাস্বত্ব বলে।

প্রত্যেক ব্যক্তির যে সকল স্বত্ব আছে, যত কাল তাহা রাজনিয়মানুযায়ী না হয়, তত কাল প্রজাস্বত্ব হয় না। কোন এক খণ্ড ভূসম্পত্তি লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিরোধ হইতেছে; যত কাল রাজবিধি দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে উহাদিগের কাহারও অধিকার নির্ণীত না হয়, তত কাল উহাতে কাহারও প্রজাস্বত্ব নাই।

প্রজাশক্তিই রাজশক্তির স্রষ্টা। অতএব যত কাল কোন প্রজা প্রজাশক্তির এক অঙ্গ রূপে পরিগৃহীত না হয়, তত কাল তাহার প্রজাস্বত্ব জন্মেনা। বঙ্গদেশের কোন পরিবার ইংলণ্ডে যাইয়া বসতি করিলে যত কাল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রাপ্ত না হয়, তত কাল প্রজাস্বত্ব পাইল না।

পূর্ব্ব কালে এথেন্স ও রোম রাজ্যের অনেক প্রজা জাতি ও বংশগত পার্থক্য হেতু নাগরিকদিগের স্বত্ব (Citizenship) প্রাপ্ত হইত না। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাহাদিগের বাঙ্নিষ্পত্তি করিবারও ক্ষমতা ছিলনা। এমন কি অনেক বিষয়ে নাগরিক প্রজাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে অনেক হীনাবস্থায় থাকিতে হইত। প্রাচীন ভারতে শূদ্রদিগেরও তদ্রূপ অবস্থা ছিল।

৩৩। প্রজাশক্তি সুনিয়মিত করিবার জন্য ও প্রজাস্বত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, প্রজাশক্তির প্রদত্ত ক্ষমতা

ক্রমে রাজশক্তি পরিচালিত হইতে যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে রাজ কার্য্য বলে

বাস্তব প্রজার মঙ্গলের জন্যই রাজ্যের উন্নতি ও সুশাসন কল্পে রাজা যে কার্য্য করেন, ও যে কার্য্য করিলে প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতার অতি-ব্যবহার না করেন সেই কার্য্যকেই রাজকার্য্য বলে রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ রাজা যে কার্য্য করেন, তাহা রাজকার্য্য।

কাহারও জীবন নাশ করা যদি রাজশক্তির ক্ষমতাতীত হয়, আর রাজা তাহা করেন, তবে তাহা রাজকার্য্য নহে।

কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার জন্য প্রজাশক্তির সাহায্য কামনায় রাজা প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি আহ্বান করেন, এটী যেমন রাজ কার্য্য; তেমনই আবার নগরে শান্তি রক্ষার জন্য রাত্রিযোগে পথ পার্শ্বে যে প্রহরী দণ্ডায়মান আছে, সেও রাজকার্য্য করিতেছে

ইংলণ্ডের রাণী মনে করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে রুসিয়ার সিংহাসনে বসাইবেন, তদর্থে তিনি যে কার্য্য করিলেন, তাহা ইংলণ্ডের রাজকার্য্য নহে

৩৪। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে ব্যয় আবশ্যক, তাহাকে রাজব্যয় বলে

ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে যে ব্যয় হয়, তাহা যেমন রাজব্যয়, তেমনই গ্রাম্য চৌকীদারকে যে বেতন দেওয়া যায়, তাহাও রাজব্যয়

৩৫। রাজব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজা যে ধন সংগ্রহ বা সঞ্চয় করেন তাহাকে রাজস্ব বলে।

যে অর্থ নিয়মিত রূপে ব্যয়িত হইবার জন্য সংগৃহীত হয়, তাহা রাজস্ব। বর্ষে বর্ষে এ দেশে ভূমির রাজস্ব প্রভৃতি যাহা সংগৃহীত হইয়া ব্যয়িত হইতেছে, তাহা যেমন রাজস্ব, সেইরূপ রাজ্যের ভাবী উন্নতিকল্পে যে ধন সঞ্চিত হইতেছে, ভবিষ্যতে যাহা রাজব্যয়ে লাগিবে, তাহাও রাজস্ব কোন দেশের রাজা যদি অন্য রাজাকে ঋণ দিয়া রাখেন, তাহাও রাজস্ব সেই ঋণের যে সুদ পাওয়া যায় তাহাও রাজস্ব

যে কোন ধন রাজা রাজ্যের সুশাসন বা উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে পারেন, তাহাই রাজস্ব প্রজার দত্ত ধন রাজস্ব, রাজ্য মধ্যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি রাজস্ব রাজা কোন ব্যবসায়াদি করিয়া যে লাভ করেন, তাহা রাজস্ব যুদ্ধে জয় লাভ হেতু লুণ্ঠিত ধন ও রাজস্ব।

রাজস্ব শব্দের অর্থ কেবল প্রজার দত্ত নিয়মিত খাজানাদি নহে

৩৬। রাজব্যয় কুলাইবার জন্য বা প্রজাসাধারণের হিতার্থে প্রজা-শক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে রাজা যে ঋণ করেন, তাহাকেই রাজঋণ বলা যায়।

রাজা স্বকার্য্য সাধনের জন্য কোন ঋণ করিলে তাহা রাজঋণ হইবে না, কেন না রাজ্যের হিতার্থে যে ঋণ করা যায় তাহাই রাজঋণ।

রাজ্যের হিতার্থেও যদি রাজা কোন ঋণ করেন, যাহা করাতে যদি প্রজাশক্তি প্রদত্ত ক্ষমতার অতিক্রম করা হয়, তাহা রাজঋণ নহে

ফ্রান্স প্রুসিয়ায় যুদ্ধ হইয়া ফ্রান্স প্রুসিয়াকে দুই শত কোটী টাকা দানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিলেন, যতকাল ঐ সমস্ত টাকা না দেওয়া হইল, ততকাল উহা ফরাশিদিগের রাজঋণ রহিল

এদেশে প্রমিসরি নোট রূপ প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগ

হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও গবর্ণমেণ্টকে সেই অর্থ প্রত্যাহার করিতে হইবে না, তথাপি উহা রাজঋণ ; কেন না ঐ অর্থের সুদ দিতে হইবে

রাজঋণ রাজা ভিন্ন রাজ্য হইতেও করিতে পারেন, প্রজাবর্গ হইতেও করিতে পারেন

৩৭। রাজব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রজাদিগকে যে ধন দান করিতে হয়, অর্থাৎ যাহা না দিলে প্রজাস্বত্ব অব্যাহত থাকেনা, তাহাকে কর বলে।

প্রজার মঙ্গলই রাজকার্য্যের উদ্দেশ্য, সুতরাং প্রজার মঙ্গলার্থেই রাজব্যয় হইয়া থাকে যে প্রজা রাজব্যয় যোগাইতে অসম্মত হইবে, তাহাকে ঐ মঙ্গল লাভেও বঞ্চিত হইতে হইবে।

এ দেশে ভূম্যধিকারীগণ নিজ নিজ ভূসম্পত্তির জন্য রাজাকে বার্ষিক কতক অর্থ দিয়া থাকেন, উহা কর কেন না ঐ অর্থ না দিলে উক্ত ভূমিতে তাঁহাদিগের প্রজাসত্ব (এখানে ভূম্যধিকারীত্ব) থাকে না

কিন্তু যদি কোন ভূম্যধিকারী দুর্ভিক্ষাদি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টকে কতক টাকা দান করেন, তাহা উপঢৌকন হয়, রাজস্ব হয় না কেন না ঐ অর্থ না দিলেও ভূম্যধিকারীর প্রজাস্বত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত হইত না

যদি এরূপ রাজবিধি প্রচলিত হয়, যে প্রত্যেক প্রজাকেই স্বকীয় উপার্জ্জনের কিয়দংশ রাজ সরকারে দান করিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ দেয় অর্থ কর হয়

কোন ব্যবসায় করিতে হইলে যে অর্থ ঐরূপে রাজাকে দিতে হয়, তাহাও কর।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এবং তদপেক্ষা ইদানীন্তন কালে ইউরোপ খণ্ডে একরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল, উহাকে মণ্ডলী প্রণালী (Feudal system) বলিত উহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগকে কোন প্রকার কর দান করিতে হইত না দেশ এবং জনসংখ্যার বিভাগ করিয়া এক এক জন প্রধান লোকের উপর এক এক বিভাগের ভার অর্পিত হইত। তদ্ধেতু সে রাজ সরকারের কতকগুলি কার্য্য করিতে বাধ্য হইত অর্থাৎ উৎসবাদিকালে দ্রব্য সামগ্রী ও যুদ্ধাদিকালে সৈন্যাদি যোগাইত। সেই ব্যক্তিও আবার নিজ বিভাগে ঐরূপ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াই স্ববিত্ত শাসন সংরক্ষণ করিত।

৩৮। প্রাপ্তবয়স্ক প্রকৃতিস্থ মস্তিষ্ক, অনুদাসীন ও স্বাধীন অর্থাৎ স্বমত প্রদানে অধিকারপ্রাপ্ত মনুষ্য মাত্র-কেই ব্যক্তি বলা যায়।

যাহারা বিচারক্ষম অর্থাৎ রাজ্যশাসন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার উপযুক্ত, যাহারা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মতামত প্রদানে অধিকারপ্রাপ্ত ও রাজ্যশাসনের সাহায্য করিতে বাধ্য অর্থাৎ তাহা না করিলে দণ্ডিত হয়, তাহারাই ব্যক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যক্তি

শিশু ব্যক্তি নহে। স্বভাবতঃ অবোধ বা উন্মাদ ব্যক্তি নহে। যে কেহ লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইয়াছে, সে ব্যক্তি নহে। যে ব্যক্তি ব্যবসায়াদি করিয়া অন্যলোকের সাহায্য করেনা, সে ব্যক্তি নহে। ভিক্ষুক ব্যক্তি নহে।

সমাজে থাকিয়া কোন ব্যক্তিই এমন উদাসীন হইতে পারেনা, যে সে কাহারও উপকার না করিলেও প্রত্যাশী না হইয়া পারে। যাহারা

সমাজের কোন ক্ষতি না করিয়া সমাজের অনুগ্রহেই জীবিত থাকে, তাহাদিগকে ব্যক্তি বলা যায় না, কেননা ব্যবহার দর্শনানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ-শক্তির এক অঙ্গ

৩৯। রাজ্যের সুশাসনকল্পে অর্থাৎ রাজশক্তি সুনিয়মিত ও প্রজাস্বত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, প্রজাবর্গ আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করণার্থ যাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে মনোনীত করে; এবং ঐ রূপ করিলেই যাহাদিগের কতকগুলি বিশেষ অধিকার জন্মে, তাঁহারা যত কাল প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে প্রজা-প্রতিনিধির কার্য্য করেন, তত কাল তাঁহাদিগকে প্রজা-প্রতিনিধি বলে।

রাজাও প্রজাবর্গের প্রতিনিধি বটেন। তিনি প্রজাশক্তির আংশিক প্রতিনিধি মাত্র প্রজার সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি নাই। প্রজাবর্গ স্বেচ্ছায় রাজাকে কতকগুলি শক্তি দিয়া তাহারই অনুগমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইক্ষণ যাহাতে তিনি সেই শক্তির অপব্যবহার না করেন, এবং যাহাতে সেই শক্তির সদ্ব্যবহারের উপায় হয়, এইজন্যই প্রজা প্রতিনিধি-প্রণালীর সৃষ্টিও আবশ্যক

যে রাজ্যে প্রজা-প্রতিনিধি মনোনয়নের যেরূপ প্রতিষ্ঠিত বিধি থাকে, সেই অনুসারেই প্রতিনিধি মনোনীত করিতে হয় অন্যথা প্রতিনিধি হয় না সাধারণতঃ প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা, বয়ক্রম অবস্থাও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম থাকে

অধিকাংশ প্রজা মনোনীত করিলেই প্রজাবর্গের মনোনীত হয়

হয়। যদি কোন স্থলের প্রজাবর্গের দুইশত কাহাকেও মনোনীত না করে এবং অবশিষ্ট তিনশত মনোনীত করে, তাহা হইলেই প্রজাবর্গের মনোনীত করা হয়। কিন্তু যদি কোন রাজ্যে এরূপ বিধি থাকে, যে প্রতিনিধি মনোনয়ন কালে ভদ্রবংশীয় এক ব্যক্তির মত ইতর শ্রেণীস্থ দুই ব্যক্তির মতের সমান হয়, তবে দুইশত ভদ্রবংশীয়ের মনোনয়নই তিনশত ইতর শ্রেণীস্থের মনোনয়ন উপেক্ষা করিয়া, প্রজাবর্গের মনোনয়ন হইবে।

প্রজা প্রতিনিধি মনোনীত হইবামাত্রই সাধারণ প্রজা অপেক্ষা তাঁহার কতকগুলি বিশেষ অধিকার জন্মে, নচেৎ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন সাধন হয় না। রাজার যেমন রাজশক্তি পরিচালিত করিবার উপযোগী কতকগুলি রাজকীয় বিশেষ অধিকার থাকে, এই প্রতিনিধিদিগের-ও প্রজাশক্তি পরিচালিত করিবার ও প্রজাস্বত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য সেইরূপ কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রজা প্রতিনিধিদিগের এইরূপ বিশেষ অধিকার থাকে যথা—রাজা তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। প্রজা প্রতিনিধিরা রাজপদ্ধতি বা শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী হইলে সামান্য প্রজার ন্যায় তাহার বিদ্রোহাপরাধ হইবে না ইত্যাদি।

প্রজা প্রতিনিধির কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে যতকাল আবশ্যক, ততকাল মনোনীত প্রতিনিধি প্রজা প্রতিনিধি বটেন, অন্য সময়ে নহেন। রাজার সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা।

এইরূপ প্রতিনিধিরা যখন প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে আপনাদিগের স্থলবর্ত্তীরূপে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তিনি বা তাঁহারা ও প্রজাপ্রতিনিধি হন।

৪০। প্রজা-প্রতিনিধিরা প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে যখন মিলিত হইয়া কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই সম্মিলনকে প্রজা-প্রতিনিধিসভা বলে;

সকলই বিধি অনুসারে হওয়া চাই যদি কোন রাজ্যে এরূপ বিধি থাকে, যে রাজাই প্রজা-প্রতিনিধিদিগকে আবশ্যকতা অনুসারে যথা নিয়মে যথা কালে ও যথা স্থানে সমবেত করিবেন, আর যদি প্রজা প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় অনাহূত হইয়া অন্যত্র সম্মিলিত হন, তবে সে সম্মিলন প্রজা-প্রতিনিধিসভা হয় না, অথবা তৎকৃত কার্য্য ও প্রতিনিধি সভার কার্য্য হয় না

৪১। প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে রাজার দত্ত ক্ষমতা ক্রমে যে বক্তি যত কাল রাজশক্তির সর্ব্বাঙ্গ, অথবা একাঙ্গ প্রয়োগ করেন, ততকাল তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি বলে।

রাজার অনুপস্থিতি কালে যিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনি রাজপ্রতিনিধি

রাজা অক্ষম হইলে যিনি তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তিনি রাজ প্রতিনিধি।

এই প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত বিধির অমতে সিদ্ধ হইবে না। যদি কোন রাজ্যে এরূপ বিধি থাকে যে রাজার অনুপস্থিতিতে তদীয় কনিষ্ঠ তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন, আর যদি রাজা ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া পুত্রকে প্রতিনিধি করেন, তবে সেই পুত্র প্রতিনিধি নহেন

একথা বুঝিতে হইবে যে যিনি যতকাল বিধি অনুসারে রাজশক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকারী তত কাল তিনি রাজপ্রতিনিধি; অন্যথা

নহেন বিচারক যত কাল রাজদত্ত ক্ষমতাক্রমে বিচার করেন, তত-কাল রাজপ্রতিনিধি। সেনাপতি যতকাল রাজদত্ত ক্ষমতাক্রমে যুদ্ধ বা সৈন্য প্রস্তুত করেন, তত কাল তিনি রাজ প্রতিনিধি প্রহরী যতক্ষণ শান্তিরক্ষা করে, ততক্ষণ সে রাজপ্রতিনিধি।

রাজদত্ত ক্ষমতাক্রমে কোন রাজপ্রতিনিধি অন্য কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলে যতক্ষণ সে সেই কার্য্য করে, ততক্ষণ সে রাজপ্রতিনিধি হয় কোন বিচারক যদি বিচার কার্য্যের সাহায্যার্থে রাজদত্ত ক্ষমতাক্রমে কাহাকেও নিযুক্ত করেন, যতকাল তিনি সে সাহায্য করেন, ততকাল তিনি রাজ প্রতিনিধি। কোন পদাতি যদি রাজদত্ত ক্ষমতাক্রমে কাহাকে মজুর নিযুক্ত করে, তবে সেই মজুর যতকাল ঐ মজুরী করে, ততকাল সে রাজ প্রতিনিধি বটে

বাস্তব রাজ্যশাসন সম্বন্ধে রাজার যত কার্য্য আবশ্যক তাহা অর্থাৎ রাজ শক্তির সম্যক পরিচালন রাজা একাকী কদাপি করিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়। যাহারা রাজার কোন কার্য্য করে, তাহারাই রাজপ্রতিনিধি সাধারণতঃ অন্যান্য রাজপ্রতিনিধিদিগকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া যিনি রাজার অনু-পস্থিতিতে বা অক্ষমতা হেতু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন ভার গ্রহণ করেন তাঁহাকেই রাজ প্রতিনিধি বলে।

৪২। রাজ্যশাসনের কতক গুলি বিভাগ আছে, যে সকল লোক সেই সেই বিভাগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য নিযুত হন, তাঁহাদিগকে রাজমন্ত্রী বা সচীব বলা যায়।

রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যিনি পরামর্শ প্রদান করেন, তাঁহাকে রাজস্বমন্ত্রী বা রাজস্বসচীব বলে।

ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কর্ত্তব্য কার্য্যের পরামর্শদাতাকে পররাষ্ট্রসচীব বলে

প্রজামাত্রেরই রাজাকে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে, অতএব প্রজামাত্রেই মন্ত্রী নহে, যাঁহারা ঐরূপ পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত, তাঁহারাই মন্ত্রী বা সচীব নামে অভিহিত।

৪৩। রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে অর্থাৎ রাজ্যের সুশাসন ও সংরক্ষণার্থে প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে রাজা যে লোকবল অর্থাৎ সৈন্য সামন্ত নিযুক্ত করেন, তাঁহা-দিগকে রাজবল বলা যায়।

৪৪। রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন জন্য রাজা যাহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক বলে

যাহা প্রকৃত রাজ্য, সেখানে কোন ব্যবস্থাই রাজা ও প্রজা উভয়ের সম্মতি ভিন্ন প্রচলিত বা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না কিন্তু ঐরূপ কোন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন কি পুরাতন ব্যবস্থাদির সংস্কার করিবার ভার কতিপয় ব্যক্তির উপরে অর্পিত থাকে। প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে রাজাই তাহাদিগকে নির্ব্বাচন ও নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

কোন রাজ্যে রাজার হস্তে এই অধিকার না দিয়া প্রজা সাধারণ ও ব্যবস্থাপক মনোনীত বা নিযুক্ত করিতে পারে।

৪৫। রাজ্যে প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধির অন্যথাচরণকে অপরাধ বলে।

রাজ্যে বহুবিধ ব্যবহারশাস্ত্র প্রচলিত থাকে, সেই সকল শাস্ত্রের যে কোন বিধি লঙ্ঘন করিলেই অপরাধী হইতে হয়, তবে কোন একরূপ কার্য্য করিয়া একব্যক্তি যে অপরাধে অপরাধী হইল, অবস্থান্তর হেতু তাহা করিয়া অন্যব্যক্তি অপর অপরাধে অপরাধী হইতে পারে ব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বাধ্য করে বলিয়াই এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে।

কোন কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত নাও হইতে পারে, কিন্তু যদি উহা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার-শাস্ত্রের বিরোধী না হয়, তাহা হইলেই উহা অপরাধ নহে বহুবিবাহ অসঙ্গত কর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু এযাবৎ এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে উহা ব্যবহার-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এইক্ষণ যে কেহ বহুবিবাহ করে, এদেশে সে অপরাধী হয় না।

৪৬। অপরাধীর চরিত্রে সংশোধন ও তৎকৃত সমাজের ক্ষতিপূরণ ও তৎকর্ত্তৃক সমাজের সম্ভাবিত ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্য ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে তাহাকে যে শাসন করা যায়, তাহাকে দণ্ড বলে।

দণ্ডের উদ্দেশ্য কৃত কর্ম্মের প্রতিশোধ লওয়া নহে উহার উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গল সাধন চতুর্ব্বিধ উপায়ে দণ্ডদ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়।

১ অপরাধী ব্যক্তিও সমাজের এক অঙ্গ তাহার চরিত্রের উৎকর্ষে সমাজ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়

২। অপরাধী সমাজের যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার পূরণ করিলে সমাজ প্রকৃতিস্থ থাকে।

৩। দণ্ড না পাইলে অপরাধী প্রশ্রয় পাইয়া ভবিষ্যতে সমাজের আরোও ক্ষতি করিতে পারিত, দণ্ডে তাহার পথ রোধ হয়

অপরাধী দণ্ড না পাইলে অন্যেরা ও তদ্দর্শনে সাহসী হইয়া ঐরূপ অপরাধ করিতে পারে এইরূপে সমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, দণ্ডে এই আশঙ্কার নিরাকরণ হয়

ব্যবহারশাস্ত্রে যে সকল দণ্ডের বিধি আছে তাহাই দণ্ড, অন্য কিছু দণ্ডনহে শাস্ত্রাতিরিক্ত যাহা, তাহা অত্যাচার। অস্মদ্দেশে নাশা কর্ণ ছেদন দণ্ডনহে

৪৬ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে, অপরাধীর দণ্ড বিধান করিবার জন্য রাজা যাহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে বিচারক বলে।

বিচারক স্বহস্তে দণ্ড প্রদান করেন না, দণ্ড নির্ব্বাচন অর্থাৎ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন বাস্তব বিচারকের কার্য্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্যের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে; সে কার্য্য করিয়াছে কি না, করিয়া থাকিলে এবং তাহা অপরাধ হইলে তাহার কি দণ্ড হওয়া উচিত; ইহাই স্থিরীকৃত করা

৪৭ অপরাধীদিগকে দণ্ড প্রয়োগ, প্রজাসাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষা, রাজস্বসংগ্রহ ও রাজব্যয় নির্ব্বাহাদি কার্য্যের জন্য প্রজাশক্তির দত্ত ক্ষমতা ক্রমে রাজা যাহাদিগকে নিযুক্ত করেন, অপিচ যে সকল রাজকর্ম্মচারী

বিচারক, ব্যবস্থাপক বা রাজবল নহে, তাহাদিগকে কার্য্য-নির্ব্বাহক বলা যায়।

এ দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী কার্য্য নির্ব্বাহক। শান্তি রক্ষক (পুলিস) কার্য্যনির্ব্বাহকের এক শাখা মাত্র।

৪৮ যতগুলি লোক এক রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও স্থায়ীরূপে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বসতি করিয়া সম্পূর্ণ প্রজাস্বত্বে স্বত্ববান হয়; তাহাদিগকে এক জাতি বলে।

কোন ইংরেজ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ভারতবর্ষে বহুকাল বসতি করিলেও ভারতবর্ষীয় হয় না, কেননা সে এদেশে জন্ম গ্রহণ করে নাই, অপিচ তাহার পুত্র পৌত্রাদি ইংলণ্ডেই বসতি করিবে।

কিন্তু একমাত্র জন্ম গ্রহণ ও স্থায়ী রূপে বসতিই কোন জাতিত্বের কারণ নহে কোন রাজ্যে জন্মিয়া কি স্থায়ী রূপে বসতি করিয়া সম্পূর্ণ প্রজাস্বত্ব না পাইলে সেই জাতীয় হওয়া যায় না কোন যীহুদী বা কোন ভারতবর্ষীয় ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারী হইয়া সেখানে স্থায়ীরূপে বসতি করিয়াও যদি ইংলণ্ডীয় উত্তরাধিকার-বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম না হয়, তবে সে ইংরেজ হয় না।

এক ব্যক্তিতে যেমন দুই ব্যক্তিত্ব আসিতে পারে না, সেইরূপ এক ব্যক্তি দুই জাতীয় হইতে পারে না, যখনই কোন ইংরেজ ভারতবর্ষীয় হইবে, অমনি তাহার ইংরেজত্ব লোপ পাইবে।

কোন জাতীয় হইতে হইলেই কোন রাজ্যে জন্ম গ্রহণ ও স্থায়ীরূপে বসতি আবশ্যক একজন ভারতবর্ষীয় ইংলণ্ডে যাইয়া যদি সৌভাগ্য

ক্রমে তথাকার সম্পূর্ণ প্রজাস্বত্ব লাভ করিয়া ইংরেজ হয়, আর পাঁচ বর্ষ পরে ফ্রান্সে যাইয়া ঐরূপে ফরাসী হয়, তবে এক ব্যক্তির জীবনে সে দশ জাতীয় হইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ অধিকার পাইলে বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের উপকারিতা থাকেনা, এবং এইরূপে জনসমাজে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে

সাধারণতঃ চারি প্রকার জাতি কথিত হইয়া থাকে,—১ জন্মগত, ২ বংশগত, ৩ ধর্ম্মগত, ও ৪ ব্যবহারিক শরীর মনের গঠনের বিভিন্নতা হেতু একজাতি হয় যেমন মনুষ্য পশু, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বংশগত এক রূপ জাতি আছে যেমন আর্য্য, নিগ্রো ইত্যাদি এক এক ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে এক এক জাতি বলিবার প্রথা আছে, যেমন হিন্দুজাতি, মুসলমান-জাতি ইত্যাদি। কিন্তু যে জাতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে উহাই প্রকৃত জাতি, উহারই নাম ব্যবহারিক জাতি, ব্যবহার শাস্ত্রে উহা ভিন্ন অন্য কিছুকেই জাতি বলা যায় না।

শরীর মনের গঠন সাম্য, এক বংশজত্ব, এক ধর্ম্মমত ও একভাষীত্ব প্রভৃতি এক জাতিত্বের লক্ষণ বটে; কিন্তু কারণ নহে

৪৯ কোন রাজ্যে যত গুলি লোক বাস করে, তন্মধ্যে এক এক ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এক এক সম্প্রদায় বলে।

ভারত রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, পারসী ও ব্রাহ্ম প্রধানতঃ এই কয় সম্প্রদায় প্রজা আছে

৫০। রাজ্য মধ্যে যত গুলি লোক এক একটী ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহাদিগকে এক শ্রেণী বলা যায়।

কৃষক, শিল্পী, যাজক, ইহারাই এক এক শ্রেণী প্রত্যেক সম্প্রদায় মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে, যেমন হিন্দুর মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব, মুসলমানে সিয়া সুনি ইত্যাদি সেই রূপ আবার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও বিভাগ আছে যেমন কৃষকের মধ্যে চাষী ও মালী ; শিল্পীর মধ্যে তন্তুবায় ও কর্ম্মকার ইত্যাদি । সম্প্রতি ইহাদিগের বিষয় কিছু বলা গেল না।

৫১। জীবিকানির্ব্বাহ, সুখ সচ্ছন্দবৃদ্ধি অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে কোন উপায় স্থায়ীরূপে অবলম্বন করা যায় তাহাকে বৃত্তি বলে।

জীবিকানির্ব্বাহ যাহাতে না হয়, তাহাতে সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইতে পারে। সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য না হইয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্যও বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি উদরান্নের জন্য কাহারও দাসত্ব করিতেছে, সে দাস্যবৃত্তি করিতেছে। এক ব্যক্তির প্রচুর সঙ্গতি আছে তথাপি স্বকীয় বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য বারম্বার বিবাহ করিতেছে, সে বিবাহবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে কৃপণ কেবল ধন সঞ্চয়ের জন্য যে কোন উপায় অবলম্ব করে তাহা বৃত্তি হয়।

কোন কার্য্য করিলেই তাহা বৃত্তি হয়না। কোন উদ্দেশ্য করিয়া কোন রূপ কার্য্য করিতে থাকিলেই তাহা বৃত্তি হয় ঐরূপ করিতে থাকাকেই স্থায়ীরূপে তদুপায় অবলম্বন করা বলা যায়

এক ব্যক্তি দৈবাৎ অথবা প্রলোভনে পড়িয়া প্রতিবেশীর বস্ত্র খণ্ড অপহরণ করিয়াছে বলিয়া সে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাই

। যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের

উপকার করতঃ প্রত্যুপকার কামনা করা যায়, তাহকে ব্যবসায় বলে।

সকল বৃত্তি ব্যবসায় নহে, যাহাতে সমাজের মঙ্গল নাহয়, তাহা ব্যবসায় নহে দস্যু বৃত্তি ও বিবাহ বৃত্তি ব্যবসায় নহে

ব্যবসায়ের মূল হইতেছে পরিশ্রম ও উপকারের বিনিময় আমি দূর দেশহতে পণ্য দ্রব্য পরিশ্রম করিয়া স্বদেশে আনিয়া উপকার বিতরণ করিতেছি এবং তদ্বিনিময়ে স্বদেশীয়েরা পরিশ্রমজাত অর্থ দ্বারা আমার প্রত্যুপকার করিতেছে, এই বণিকবৃত্তি আমার ব্যবসায়। উপকার করিয়া প্রত্যুপকার কামনা করিলেই ব্যবসায় হয়, নচেৎ নহে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও তদ্বিনিময়ে ভরণ পোষণ প্রত্যাশা করে, সে ব্যবসায় করে যাজকেরা ধর্ম্মব্যবসায়ী যে ব্যক্তি স্বদেশেরমঙ্গলো-দ্দেশে গ্রন্থ প্রচার করিয়া কোন প্রত্যুপকার কামনা করেনা, সে সাহিত্য ব্যবসায় করে না।

কোন কার্য্যের একাঙ্গ ব্যবসায় না হইয়া অপরাঙ্গ ব্যবসায় হইতে পারে। এক দেশে লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য দেশান্তরে বিক্রয় করিলে, ঐ লুণ্ঠন ব্যবসায় নহে, বিক্রয় ব্যবসায় হইতে পারে

৫৩। পণ্য দ্রব্যের বিনিময় ব্যবসায়কে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্য দুইপ্রকার, অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। কোন রাজ্যের প্রজা বর্গের মধ্যে যে পরস্পর পণ্যের বিনিময়, তাহাকে অন্তর্ব্বানিজ্য বলে আর বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যে বানিজ্য তাহাই বহির্ব্বানিজ্য। সমস্ত রাজ্যের বানিজ্যকে জাতীয় বাণিজ্য বলে।

৫৪। মৃত্তিকাতে ফল শস্যাদি উৎপাদন করা ব্যবসায়কে কৃষি বলে।

কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ দুই প্রকার, উদ্যানকৃষি ও ক্ষেত্র কৃষি। সমস্ত রাজ্যের কৃষিকে জাতীয় কৃষি বলে।

৫৫। তৃণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ব্যবসায়কে শিল্প বলে।

শিল্প দুই প্রকার, সূক্ষ্ম ও স্থূল; চিত্রাঙ্কন ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণাদি সূক্ষ্ম, গৃহ ও নৌকাদি নির্ম্মাণ স্থূল। রাজ্যের সমস্ত শিল্পকে জাতীয় শিল্প বলে।

৫৬। গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও সংবাদপত্রাদি প্রচার ব্যবসায়কে সাহিত্য বলে।

সাহিত্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সুকুমার ও উৎকট। কাব্যাদি সুকুমার ও দর্শনাদি উৎকট সাহিত্য। রাজ্যের সমস্ত সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলে।

৫৭। নৃত্য গীত বাদ্য ও অভিনয়াদি ব্যবসায়কে সঙ্গীত বলে।

সঙ্গীত বহু বিধ, প্রধানতঃ উহা দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতেপারে, যথা-সরল ও বিমিশ্র। একমাত্র নৃত্য, কি গীত কি বাদ্যই সরল সঙ্গীত, উহাদিগের একাধিকের মিশ্রণই বিমিশ্র সঙ্গীত। অভিনয় বিমিশ্র সঙ্গীত। রাজ্যের সমস্ত সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত বলে।

৫৮। যে কোন প্রতিশ্রুত ধনলাভের জন্য অঙ্গীকার কর্ত্তার আদেশানুসারে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করা যায়, তাহাকে বেতন বলে।

৫৯। যে কোন প্রতিশ্রুত ধনলাভের জন্য পরিশ্রম করা যায়, তাহাকে পারিশ্রমিক বলে

বেতন এবং পারিশ্রমিক মুদ্রা না হইয়া অন্য কিছুও হইতে পারে।

বেতন ও পারিশ্রমিকে প্রভেদ এই যে, বেতন গ্রহণ করিলেই বেতনদাতার উদ্দেশে কোন এক নিয়মিত কাল পরিশ্রম করিতে হয়, আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া যে কেহ আত্ম ইচ্ছায় পরিশ্রমের তারতম্য করিতে পারে; তাহাকে কেবল কার্য্যোদ্ধার করিতে হয় মাত্র।

প্রতিশ্রুত লাভের জন্য না হইয়া পরিশ্রম করিয়া কোন কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা যে লাভ হয়, তাহা উহার মূল্য, বেতন বা পারিশ্রমিক নহে।

কোন কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিয়া বেতন, পারিশ্রমিক বা মূল্যের অতিরিক্ত যে ধন লাভ করা যায় তাহাই পুরস্কার

৬০। বেতন গ্রহণ করিয়া রাজ প্রতিনিধির (রাজকর্ম্মচারীর) কার্য্যকরাকে রাজসেবা কহে।

বেতন গ্রহণ করিয়া অর্থ যে সকল কার্য্যে বেতন আছে, সেই কার্য্য স্বীকার করিয়া। এ দেশে রাজপ্রতিনিধি রাজসেবা করিতেছেন।

ইংলণ্ডে যে সকল প্রজা-প্রতিনিধি ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়া রাজ্য শাসনের সহায়তা করেন, তাঁহারা রাজসেবা করেন না, কেন না তাহারা বেতন গ্রহণ করেন না। তাঁহারা তদ্দেশীয় রাজশক্তির প্রতিনিধি নহেন।

৬১। বেতন গ্রহণ করিয়া পরিশ্রম করাকে চাকুরি বলে।

৬২। পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করাকে মজুরি বলে।

৬৩। যে ধনে যাহার কোন প্রকার অব্যাহত স্বত্ব থাকে, অর্থাৎ যে স্বত্ব সে স্বয়ং নষ্ট না করিলে অন্যে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারেনা; পরন্তু ঐ স্বত্ব সে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনিময়ও করিতে পারে, তাহা-কেই সম্পত্তি বলে।

পুত্র কন্যার উপর পিতা মাতার কোন কোন প্রকার অব্যাহত স্বত্ব আছে বটে, তাই বলিয়া সন্তান সম্পত্তি নহে, কেননা সন্তান ধন নহে।

রাজপথে হাটিয়া যাইবার অব্যাহত অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে উহা হইতে কাহাকেও কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না এজন্য রাজপথ কাহারও সম্পত্তি নহে, কেননা রাজপথের ঐ অধিকার কাহারও বিনিময় করিবার ক্ষমতা নাই।

বন্ধুর বিত্তে আমি প্রতিপালিত হইতেছি বলিয়া উহা আমার সম্পত্তি নহে, কিন্তু যদি বন্ধু আমাকে তাহার কোন বস্তু স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান করেন, তবে উহা আমার সম্পত্তি হয়।

ভূম্যধিকারী প্রজাকে এইরূপে একখণ্ড ভূমি কৃষি করিতে দিলেন, য তাহা তিন বৎসর মধ্যে ছাড়াইয়া লইতে পারিবেন না। এস্থলে ঐ ভূমি তিন বৎসরের জন্য প্রজার একরূপ সম্পত্তি হইল, কেননা সে উহাতে কৃষি করিবার স্বত্ব অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারে

৬৪। কোন সম্পত্তিতে কাহারও যে স্বত্ব আছে, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করিলে

যে অর্থ লাভ করা যায়, তাহাকে সেই সম্পত্তিতে সেই স্বত্বের উপস্বত্ব বলে।

কোন এক সম্পত্তিতে কাহারও অনেক প্রকার স্বত্ব থাকিতে পারে একখানি গৃহে আমার স্বামিত্ব স্বত্ব, ভোগ স্বত্ব, এবং বসতি স্বত্ব থাকিতে পারে; অর্থাৎ ঐ গৃহ আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি,- আমি যাবজ্জীবন উহা ব্যবহার করিতে পারি, এবং উহাতে যখন ইচ্ছা বসতি করিতে পারি। আমি কখনও ঐ গৃহে কতকদিনের জন্য কাহাকেও বসতি করিতে দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি কাহাকেও বা যাবজ্জীবন ভোগ করিবার অধিকার দান করিতে পারি। উহা আমি যথেচ্ছ বিক্রয় করিতে পারি।

এক খণ্ড ভূমিতে আমার প্রজা স্বত্ব আছে, আমি ঐ ভূমিতে আমার সেই স্বত্ব বজায় রাখিয়া ঐ ভূমির কোন, ব্যবহার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করি, তাহা আমার উপস্বত্ব হয়।

কোন বস্তু বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা উহার উপস্বত্ব নহে।

কাহাকে ঋণ দিয়া যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা উপস্বত্ব। কিন্তু কোন বস্তু দান করিয়া যাহা উপঢৌকন পাওয়া যায়, তাহা উপস্বত্ব নহে।

বৃক্ষ কি ক্ষেত্রে যে ফল বা শস্যাদি জন্মে, তাহা উদ্যান কি ক্ষেত্র স্বামীর উপস্বত্ব।

নৌকা ভাড়া দিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা উপস্বত্ব।

এক ব্যক্তি নিজ ধনে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া যদি কাহাকে এই বলিয়া কাজে নিযুক্ত করে, যে সে চিরদিন ঐ ব্যবসায়ের চতুর্থাংশ লাভ পাইবে। এরূপ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনার সেই চতুর্থাংশ

লাভ রূপ সত্বের কোন রূপ ব্যবহার করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে সেই অর্থ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্বত্ব হয়

৬৫। কোন সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব ছিল, সেই ব্যক্তি সেই স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে সেই সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বাধিকারী কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও, যখন প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে অন্য ব্যক্তির উপর সেই সম্পত্তিতে সেই স্বত্ব বর্ত্তে, তাহাকেই উত্তরাধিকার বলে।

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ে সমাজের ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি স্বকীয় সম্পত্তি যাহা ইচ্ছা করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন কিছু করিয়া না যায়, তখন সেই সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে যাহার হয়, সেই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

—কোন সম্পত্তিই অধিকারী ছাড়া থাকিতে পারেনা। এক অধিকারী অভাবে উহাতে দ্বিতীয় অধিকারী বর্ত্তে কোন লোকের অন্য কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সে সমাজের একজন বলিয়া সমাজ তাহার উত্তরাধিকারী হয়।

সম্পূর্ণ